নব একাঙ্ক

অর্কেষ্ট্রা

কামধেনু কবচ

রক্ত কদম

অসাধারণ

স্থূর্যমুখী

বল হরি হরি বোল

টোটোপাড়া

সাংঘাতিক লোক

মাসতুতো ভাইরা

রফা

মন্মথ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

নব একাঙ্ক

প্রথম সংরক্ষণ

২৮শে মে ১৯৫৮

প্রচ্ছদ শিল্পী

পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদমুদ্রক

ভারতবর্ষ হাফটোন ওয়ার্কস

কলিকাতা

গ্রন্থ মুদ্রক

শৈলেন প্রেস

কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

নব একাঙ্ক

সূচীপত্র

শ্রীমান প্রদীপ রায়
শ্রীমতী মিত্রা সেনগুপ্তা

শুভ বিবাহে
স্নেহাশীষ

আশীর্বাদক

মন্মথ রায়

১৪ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৬৫
২৮—৫—৫৮

"একাঙ্ক নাটকের ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এই ধরণের নাটকের প্রথম প্রকাশ হয়। আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্যে একাকিঙ্কা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংলণ্ডে বার্ণাড শ, বেরী এবং গলস্ওয়াদী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের আশীর্বাদে একাঙ্কিকা ধন্য হয়নি। Curtain raiser রূপে একাঙ্ক নাটক তখন প্রায় উপহাসের বস্তু ছিল। সিন্‌জ, ইয়েটস্ এবং লেডী গ্রেগরী প্রভৃতি আইরিশ লেখক এবং লেখিকাবৃন্দ ও তাঁদের আইরিশ 'লিটেরারী থিয়েটার' এবং ডাবলিন 'আবে থিয়েটার' এবং পরবর্তীকালে ম্যাঞ্চেষ্টারে মিস্ হর্ণিম্যানের 'গেয়েটী থিয়েটার' ও গ্লাসগো 'রিপারেটরী থিয়েটার' ইংলণ্ডে একাঙ্ক নাটকের প্রসারের পথে গভীর সহায়তা করে। এইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একাঙ্কিকা সাহিত্য সমাজে তার পূর্ণ আসন লাভ করেছে। উপস্থিত ইংলণ্ডে B. D L. অর্থাৎ ব্রিটিশ ড্রামা লীগ এবং S. C. D. A স্কটিশ কম্যুনিটি ড্রামা এসোসিয়েশনের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা এবং নানারূপ প্রচেষ্টা একাঙ্কিকাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে। আমেরিকা এই নাট্য সাহিত্যের উজ্জীবনের পথে আজ শ্রেষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে।

যখন হর্ণিম্যানের ও গ্লাসগোর রিপারেটরী থিয়েটারের হাতে এই একাঙ্কিকা সাহিত্যের নব নব রূপ পরিগ্রহ করে চলেছিল ঠিক সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যেও এর অনুপ্রবেশ হয়। ১৯২৩ সালে শ্রীমন্মথ রায়ের "মুক্তির ডাক" এই পথের প্রধান পথিকৃৎ। ইতিপূর্বে একাঙ্ক নাটক যে আদৌ লিখিত হয়নি তা নয়; যে মুষ্টিমেয় কয়েকখানি লিখিত হয়েছিল তা farce নামে আখ্যাত হতে পারে; তদুপরি আবার সেইগুলি বহু দৃশ্যে সমৃদ্ধ থাকায় নিরবচ্ছিন্ন একাঙ্কিকা হয় নি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে শক্তির যে বিক্ষুব্ধ আলোড়ন দেখা দেয় তার অভাব এই জাতীয় নাটিকায় অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যায়। শ্রীমন্মথ রায়ের "মুক্তির ডাক" বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। এই নাটিকা পাঠ করে ৺প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, " 'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভাল লেগেছে……এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা। বাংলা সাহিত্যে ওই জিনিস একান্ত দুর্লভ।" বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, "এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দিঘি পদ্ম দেখলে দু' চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু' চোখ পূরে পান করেছি আপনার লেখায়।"

গ্রন্থম্ প্রকাশিত 'একাঙ্ক নাটক সংকলন' গ্রন্থে নটসূর্য
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী লিখিত ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত

অর্কেস্‌ট্রা

ক'লকাতার উপকণ্ঠে বড় রাস্তার ধারে একটি মধ্যবিত্ত পল্লী। তন্মধ্যে মধ্যবিত্ত কেরাণী মহারাজ মিত্রের বাড়ী। একটা বড় উঠোন—একদিকে বড় রাস্তা থেকে ভেতরে আসবার প্রবেশ পথ। আর একদিকে একটা বড় ঘরের চওড়া বারান্দা। উঁচু দেয়াল বাড়টি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। এই দেয়ালেরই একটা অংশে টালীর ছাউনী দিয়ে একটা শোয়ার ঘর ক'রবার প্রয়াস হয়েছে—তারও একফালি বারান্দা আছে। উঠোনে তুলসী বেদীও রয়েছে। শহরতলী বলে দুচারটে গাছ গাছড়াও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। বাড়ীটির একটা সুবিধে—রাস্তার একটা বৈদ্যুতিক আলো এ বাড়ীর উঠোনটাকে সারারাত আলোকিত করে।

মহারাজ মিত্রের বড় ছেলে আনন্দ মিত্র—যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত—বয়স বছর পঁচিশ। আনন্দ নামটি সার্থক করবার মত চেহারা তার ছিল—যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ার পর আনন্দকে নিয়ে এ দরিদ্র সংসারে বেদনার শেষ নেই। হাসপাতালে কোন "বেড্" মেলেনি তাই দেয়ালটাকে কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে তার বাসের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বারান্দাটিতেই সে বেশীর ভাগ সময় কাটায় কারণ তার ঘরটিতে কোন জানালা নেই। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ইজিচেয়ার, একটা 'টিপয়' টেবিল আর Crossword Puzzle-এর খাতা পেনসিল—এই নিয়েই তার দিন কাটে। বিলাসও একটু আছে—সেটি হ'ল একটি মাধবীলতার গাছ। কোথা থেকে নিজের হাতে এনে সে তার এই ঘরের পাশে পুঁতে তুলে দিয়েছে লতাটি। বাড়ীর আর সবাই পরিচর্যা করে আনন্দের। আনন্দ পরিচর্যা করে এই লতাটির। বসন্তের সন্ধ্যা—দেখা গেল মাধবীলতার গোড়ার মাটি আলগা ক'রে আনন্দ বারান্দায় উঠে আসতে গিয়ে একটা দমকা কাশিতে খানিকটা হাঁপাতে হাঁপাতে উঠোনে পাতা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল। বাড়ীতে তখন মা ছাড়া আর কেউ ছিল না—তুলসীমঞ্চে তিনি সন্ধ্যাদীপ দিতে আসছিলেন—সেখানে প্রদীপটি তাড়াতাড়ি রেখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম সেরে ছুটে এলেন ছেলের কাছে—হাত পাখাটি দিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগলেন। আসুন, এই অবসরে তাঁকে একটু ভাল করে দেখে নিই। বাড়ীর কর্ত্রী তিনি—বয়স বছর চল্লিশ। সুখ-দুঃখের অনেক ঝাপটা তাঁর উপর ব'য়ে গেছে, সবই তিনি সহ্য করেছেন—হাসিমুখে কি না জানি না—যদিও নাম তাঁর সুহাসিনী দেবী।

সুহাসিনী ॥ আবার তুমি বাইরে গিয়েছিলে বাবা ?

আনন্দ ॥ না-মা। মাধবীলতা গাছের মাটিটা একটু আলগা করে না দিলে আর চলছিল না।

সুহাসিনী ॥ বল্লেই সে আমরা কেউ দিতাম্। তুমি কেন গেলে বাবা—আনন্দ ?

আনন্দ ॥ মাগো—এইটুকুই আমার আনন্দ। ও আর তোমরা কেড়ে নিও না।

সুহাসিনী ॥ (তার কপালে হাত দিয়ে দেখে) আজ জ্বরটা কম আছেরে আনন্দ।

আনন্দ ॥ তা আছে। মনে হচ্ছে মা—আমি সেরে উঠবো—শীগ্‌গিরই আমি সেরে উঠবো। আবার কাজে যেতে পারবো—আবার তোমার মুখে হাসি ফুটবে। (মার মুখে কোন ভাবান্তর না দেখে) কই মা—হাসি তো ফুটলো না তোমাব মুখে! বাপ-মা কি দেখে তোমার নাম রেখেছিল সুহাসিনী—বলতে পারো ? যক্ষ্মা রোগী ছেলে নিজে বলছে সেরে উঠ্‌বে—তাও তোমার মুখে হাসি নেই ? বল মা—তুমি কি ভাবছো ?

সুহাসিনী ॥ (চম্‌কে উঠে) ভাবৃছি—সেরে উঠলে তোকে আমি 'চেঞ্জে' পাঠাবো।

আনন্দ ॥ এইবার তুমি আমাকে হাসালে মা। আজ পর্যন্ত একটা Free Bed যোগাড় হ'ল না আমার—ওষুধ-পথ্যি যোগাতে ফতুর হ'লে তোমরা—না মা সেজন্য আমি দুঃখ করছি না—তা'তেও আমার আনন্দ বুঝলে মা! মা মা আমার ঐ Crossword-এর কাগজগুলো এগিয়ে দাও না—আচ্ছা ঐ "টিপয়"টাই নামিয়ে দাও—

সুহাসিনীর তথাকরণ

(মার চিবুক নেড়ে) Free Bed পেলে এ নার্সটিকে তো আমি কাছে পেতাম না-মা। তবে হ্যাঁ—বাবা ফতুর হচ্ছেন। তা'

আমিও সেরে উঠ্‌ছি। আর—জানো মা—এবার আমি যা রোজগার করবো—হাজার হাজার টাকা—এই Crossword Puzzle-এ। হাসছো—হাসো। কিন্তু যেদিন সত্যি হ'বে সেদিন যদি হাসো- আমি দেখে নেবো মা।

সুহাসিনী ॥ শোন বাবা—ডাক্তারবাবু বলেন—এসব নিযে তোমার এত মাথার পরিশ্রম ভাল না।

আনন্দ ॥ ডাক্তারকে ব'লো—তার সেই ধিঙ্গি মেযেটাকে যেন আমার কাছে রাতদিন বসিযে রাখে। পাঠাবে সে?—পাঠাবে না তো! তবে আমার সময কাট্‌বে কিসে? নাও—সরো—(Puzzle-এর কাগজটা দেখে) না—না দাঁড়াও—আচ্ছা মা বল দেখি সেটা কি—"যারা নিশাকালে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ দান করে—চাঁদ না মদ?"

সুহাসিনী ॥ না—বাবা—ওসব আর আমাকে নয। আমি বরং তোর "ওভালটিন"টা ক'রে আনি—

সুহাসিনী যাহতে উদ্যত এমন সময গৃহকর্তা মহারাজ মিত্র প্রবেশ করলেন। মোটাসোটা ভাল মানুষটি—একহাতে বাজারের থলে আর একহাতে একটা ইলিশ মাছ

মহারাজ ॥ একটু দাঁড়িযে যাও গিন্নি।

সুহাসিনী দাঁড়িয়ে যান

সুহাসিনী ॥ পই পই করে এতবার বলে দিয়েছি আজকে বাজার এনো না—তাও তুমি—

মহারাজ ॥ দেখ গিন্নী—মাসের পযলা তারিখ—চিরকেলের অভ্যেস একটু ভাল মন্দ—

সুহাসিনী ॥ ঘরে যে বাগানের আনাজগুলো জমে রযেছে—সেগুলো খাবে কে? বেশ—আমি বিলিযে দিচ্ছি।

মহারাজ ॥ তা' বেশ তো—দাও না—

সুহাসিনী ॥ দাও না! মাইনের টাকা পকেটে উঠলেই হাত চুলকায—না?

মহারাজ॥ এই রে—মনে করে দিলে তো! হ'ল সুরু (রেগে গিয়ে) নাও ধরো—আমার দাদ চুলকোচ্ছে—

এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হ'ল। চটপট করে মহারাজবাবু তাঁর জামা গেঞ্জি ইত্যাদি খুলে' ছুড়ে ফেলে দিতে লাগলেন—কতকগুলো গিন্নীর গায়েই গিয়ে পড়লো। সুহাসিনী বাজারের থলি, মাছ ও জামা কাপড় তুলে নিয়ে অন্দরে যাওয়ার উপক্রম করলেন

মহারাজ॥ (প্রচণ্ড বেগে কোমরের দাদ চুলকাইতে চুলকাইতে) আঃ—কি সুখ! এ আনন্দের জুড়ি নেই রে বাবা! গিন্নী বাজার করেছি—সাড়ে তিন টাকা—বাকী একশ' ছয়চল্লিশ টাকা আট আনা—ঐ ঘড়ির পকেটে—গুণে নিও—বুঝলে! আঃ কি সুখ—কি আনন্দ। আ-হা-হা—ও-হো-হো—

আরও বিষম জোরে চুলকাইতে সুরু করিলেন

সুহাসিনী॥ চুলকোচ্ছো—চুলকোও—যত পার চুলকোও। কিন্তু জ্বলুনী—পুড়নী সুরু হলে আমি কিন্তু হাওয়া করতে পারবো না।

অন্দরে চলে গেলেন

মহারাজ॥ সে যখন তখন। (চুলকাইতে চুলকাইতে) এখন তো—এ-কে-বা-রে স-শ-রী-রে স্ব-র্গ-বা-স!

আনন্দ॥ নাঃ—কিছুতেই মিলছে না। এঃ—এই একটুর জন্যে Prizeটা বেহাত হয়ে যাবে? তীরে এসে তরী ডুববে? আঃ—এ দুঃখ আমি রাখবো কোথায়?

মহারাজ॥ দুঃখ আবার কোথায় বাবা। এ যে কি সুখ।

প্রচণ্ড বেগে চুলকাইতে লাগিলেন

আনন্দ॥ তুমি তো দেখছি সুখের মহাজন! আচ্ছা বাবা—বল দেখি সেটা

কি—যাহা নিশাকালে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ দান করে—চাঁদ না মদ ?

মহারাজ ॥ ও চাঁদ নয় রে বাবা—মদও নয়—ওটা দাদ ! এই তো দেখ বাবা যতক্ষণ চুলকোচ্ছিলাম সুখের সাগরে ভাসছিলাম—চুলকোনো থেমেছে দুখের আগুনে, জ্বলে পুড়ে মরছি—উঃ কে আছিস—একটু হাওয়া কর বাবা—আঃ উঃ—(আর্তনাদ)

আনন্দ ॥ দাদ ! তা হতে পারে—আচ্ছা দেখছি—

crosswardএ মনোনিবেশ। ইতিমধ্যে ভেঁপুর প্রবেশ—বয়স চোদ্দ পনের, হাফপ্যান্ট ও সার্ট

ভেঁপু ॥ মার দিয়া কেল্লা দাদা—মার দিয়া কেল্লা। তিন তিন খানা গোল—দিয়েছে ঠুকে মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল কু—পো—কা—ৎ !

মহারাজ ॥ এদিকে তোর বাবাও কুপোকাৎ রে—তোর বাবাও কুপোকাৎ। একটু হাওয়া কর বাবা—বাঁচা—

ভেঁপু হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলো। এমন সময়ে সুহাসিনীরপ্রবেশ—
হাতে একটা দাদের মলমের শিশি

সুহাসিনী ॥ আজ আর শুনবো না। আজ দাদের মলম—

মহারাজ ॥ (আঁতকে উঠে) ও-রে বাবা —ও-আমি লাগাবো না—

সুহাসিনী ॥ (কঠোর কণ্ঠে) লাগাবে না।

মহারাজ ॥ না।

সুহাসিনা ॥ দাদ তুমি সারাবে না !

মহারাজ ॥ না, আমি সারাবো না।

সুহাসিনী ॥ জ্বলে পুড়ে মরবে ?

মহারাজ ॥ আঃ ত্রিশ দিন রোজ এই এক কথা কেন ?

সুহাসিনী ॥ ভেঁপু !

ভেঁপু ॥ কি—মা।

সুহাসিনী ॥—ফুটবলের মাঠে খুব তো দেশোদ্ধার করছিস্! এবার নিজের বাড়ীতে বাপকে উদ্ধার কর দেখি। পাখা রাখ্। তোর সেই যুযুৎসু প্যাঁচ—বুড়োকে মাটিতে ফেল—

ভেঁপুর তথাকরণ

ভেঁপু ॥ ফেলেছি মা—

আনন্দ ॥ আমিও পেয়ে গেছি মা—

সুহাসিনী ॥ এবার পায়ের ওপব চেপে বসে বুড়োর দু'হাত চেপে ধর—

মহারাজ ॥ আমাকে মেরে ফেল্লোরে বাবা—আমাকে মেরে ফেল্লো—

সুহাসিনী ॥ (ভেঁপু আদেশ পালন করেছে দেখ) হ্যাঁ ঠিক হয়েছে।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ—মা—মনে হচ্ছে ঠিক হয়েছে।

সুহাসিনী ॥ এইবার আমি মলমটা লাগিয়ে দিচ্ছি---

সুহাসিনী শিশি খুলে যেই মলম লাগাতে যাবে এমন সময় মহারাজ মরীয়া হয়ে ভেঁপুকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন

ভেঁপু ॥ অ্যাঁ—ইষ্টবেঙ্গল ক্ষেপ্‌লো মা। মোহনবাগান ছাড়বে না—

পুনরায় ধরবার চেষ্টা

মহারাজ ॥ (রুদ্রমূর্তিতে বজ্রকণ্ঠে) খবরদার।

মা ও ছেলে থমকে দাঁড়াল

আনন্দ ॥ এ সব কি হচ্ছে বাবা? তোমরা এসব কি করছো মা?

সুহাসিনী ॥ ঐ দাদ উনি পুষে রাখবেন। কোন চিকিৎসা করাবেন না—সারাবেন না। রোজ আফিস থেকে এসেই অভদ্রের মত ঐ চুলকানী—জ্বলুনী পুড়ুনী। তারপরেই সব বসে হাওয়া কর। এ কি রকম পাগলামী—বল দেখি বাবা?

মহারাজ ॥ আমিও বলি তবে—শোন বাবা। যেদিন জন্মেছিলাম গণকে বলেছিল—লগন চাঁদ ছেলে জন্মাল—দুঃখী বাপ-মা আদর করে নাম রাখলো "মহারাজ"। আমি সেই মহারাজ মিত্র। কেমন মহারাজ? কিনা সদাগরী অফিসে তিরিশ টাকায় ঢুকে আজ বুড়ো বয়সে দেড়শ' টাকায় উঠেছি। বছরের পর বছর অফিসের বড়বাবুর দাঁতখিচুনী আর বাড়ীতে তোমার এই মা জননী সুহাসিনীর মুখ নাড়া—এই খেয়ে পেট ভরেছে—তার ওপর ঘরে বাইরে খাই পাওনাদারের গুঁতো। জীবনটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিষ। তার মধ্যে এক বিন্দু অমৃত—আমার এই দাদ—

আনন্দ ॥ বুঝেছি বাবা—মরুভূমিতে যেমন ওয়েসিস্।

মহারাজ ॥ তবেই বোঝ বাবা। এ দাদ আমি কেন সারাবো? এটুকু যদি যায় কি আনন্দ নিয়ে আমি বাঁচবো? তোরা ভাবছিস্ আমার মাথা খারাপ হয়েছে—আমি পাগল হয়েছি। তোদের দোষ দেব না—দোষ দেব আমার কপালের।

মহারাজের অন্দরে প্রস্থান

ভেঁপু ॥ মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল "ড্র"—মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল "ড্র"!

হাতপাখাটা নিয়ে বাবার পেছনে ছুটলো অন্দরে

আনন্দ ॥ আচ্ছা মা—বালকদের মানুষ করতে কোন্‌টা বেশী প্রয়োজন—আহার না প্রহার?

সুহাসিনী ॥ কি জানি বাপু। আহারও দিচ্ছি প্রহারও দিচ্ছি—মানুষ হবে কি গরু হবে, কে জানে?

ঠিক এই সময়ে বাইরে থেকে উঠোনে এসে দাঁড়াল মহারাজের কনিষ্ঠা কন্যা রাত্রি এবং সঙ্গে একটি তরুণ যুবক, নাম প্রদীপ চৌধুরী। রাত্রি অষ্টাদশী তরুণী—সাদাসিধে পোশাক পরিচ্ছদ—গয়নার বালাই নেই—তবু সুশ্রী। হাতে একটা সাধারণ ভ্যানিটি ব্যাগ। প্রদীপের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা—দীর্ঘ সুগঠিত দেহ—ফ্যাসনদুরস্ত পোশাক—দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের একজন ইঞ্জিনীয়ার

রাত্রি ॥ মা! প্রদীপদাকে ধ'রে নিয়ে এলাম—উনি আজ রাতের ট্রেনে মাই-থন পালাচ্ছেন।

সুহাসিনী ॥ এ মাসটা ক'লকাতায় থাক্‌বে—এই কথাই তো ছিল প্রদীপ!

প্রদীপ ॥ সরকারী চাকুরীর বিপদই এই! কখন যে কি হবে কেউ জানে না! সাধে কি মাসীমা আমি বলি—এ চাকুরীতে লাথি মেরে একবার কানাডা ঘুরে আসবো।

সুহাসিনী ॥ ব'স বাবা বসো!

প্রদীপ ॥ (ঘড়ি দেখে) বেশীক্ষণ বসতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না মাসীমা—রাত ৯টায় ট্রেন—

রাত্রি ছুটে গিয়ে একখানা হাতভাঙা চেয়ার এনে দিয়েছে। প্রদীপ তা'তে বসলো

সুহাসিনী ॥ বসো বাবা—আমি একটু চা করে আনি।

আনন্দ ॥ আমার ওভালটিনের কথাটা মা তুমি ভুলে গেছ।

সুহাসিনী ॥ কিছুই ভুলিনি বাবা। বরং তুমিই ভুলে গেছো আনন্দ সন্ধ্যের পর আর তোমায় বাইরে থাকতে নেই! রাত্রি। তোর দাদাকে ঘরে রেখে আয়।

সুহাসিনী অন্দরে চলে গেলেন। রাত্রি তার দাদাকে তুলতে গেল

রাত্রি ॥ ওঠো দাদা।

আনন্দ ॥ কিন্তু আগে বল্ দেখি রাত্রি—আচ্ছা তুমিও বল না প্রদীপ—স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য কোন্‌টা বেশী প্রয়োজন—খাওয়া না হাওয়া?

প্রদীপ ॥ সেটা আমাদের চেয়ে তুমি ভালো বলতে পারবে আনন্দদা।

আনন্দ ॥ কেন প্রদীপ?

প্রদীপ ॥ দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্যাদা বুঝি না কি না—তাই।

আনন্দ ॥ ওঃ! হ্যাঁ—আমার স্বাস্থ্যটা গেছে—তাই স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যে কোন্‌টা বেশী প্রয়োজন তা' বলবার 'অথারিটি' আমি—হ্যাঁ—আমিই। (উঠে দাঁড়িয়ে) তা আমি বলবো—খাওয়ার চেয়ে হাওয়ার প্রয়োজন বেশী। তাতে হয়ত 'পাজ্‌ল্‌'টা মিলবে না—কিন্তু তবু বলবো—তোমরা বরং আমাকে খেতে দিও না—কিন্তু আমার ঐ অন্ধকার একরত্তি ঘরটায়—অন্ততঃ আর একটা জানালা—কেটে দাও—যাতে দুনিয়ার আলো আর বাতাস আমি আশ মিটিয়ে পাই।

ব'লতে ব'লতে রাত্রির দেহে ভর দিয়ে তার নিজের ঘরে চলে গেল। ইতিমধ্যে ভেঁপু এসে প্রদীপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে

ভেঁপু ॥ এই যে জামাইবাবু!

প্রদীপ ॥ সে কি রে পাগলা! আমি আবার তোর জামাইবাবু হলাম কবে!

ভেঁপু ॥ আজকালই হবে—বাড়ির সবাই বলে যে! আচ্ছা—জামাইবাবু!

প্রদীপ ॥ (রেগে গিয়ে) ফের জামাইবাবু—

ভেঁপু ॥ আচ্ছা প্রদীপদা,—তোমাকে আমি আর কখ্‌খনো জামাইবাবু ব'লবো না যদি তুমি আমায় শীল্ড ফাইনালটা দেখিয়ে দাও

প্রদীপ ॥ স্কুল ফাইনালটা পাশ করতে পারলে না—তার আবার শীল্ড ফাইনাল—

ভেঁপু ॥ বা-রে! সে বুঝি আমার দোষ! পরীক্ষার ফিসের টাকা যদি জুটতো—দেখতে স্কুল ফাইনালকে আমি শীল্ড ফাইনাল করে ছেড়ে দিতাম। একটি পাস্‌ সঙ্গে সঙ্গে সুট্‌—সঙ্গে সঙ্গে গোল—ফার্স্ট ডিভিসনে ফার্স্ট

প্রদীপ ॥ বাঃ!

রাত্রি আনন্দের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে—তা' দেখে ভেঁপু চাপা গলায় প্রদীপকে বললে

ভেঁপু ॥ আমি চলি—

প্রদীপ ॥ কোথায়?

ভেঁপু ॥ ভেতরে—

প্রদীপ ॥ কেন?

ভেঁপু ॥ তোমার সঙ্গে ছোর্ডদি এখন একলা কথা কইবে কি না—এখন এখানে থাকলে ও চটে গিয়ে চকোলেট্ দেবে না—যাচ্ছি ছোড়দি—যাচ্ছি—

ভেঁপু ভেতরে চলে গেল। রাত্রি আনন্দের ঘর থেকে একটা মোড়া এনেছে—সেই মোড়াতে প্রদীপের সামনে বসলো

প্রদীপ ॥ ভেঁপু খুব বড "ফুট্‌বলার" হবে।

রাত্রি ॥ তা' হয়ত হবে--কিন্তু তোমার চেয়ে বড নয়—

প্রদীপ ॥ আমি আবার "ফুট্‌বলার" হ'লাম কবে?

রাত্রি ॥ সে-টা আর কেউ জানে না—জানি শুধু আমি।

প্রদীপ ॥ বা-রে! তুমি ফুটবল খেল্‌তে আমায় কখনো দেখ্‌ছো?

রাত্রি ॥ কেন দেখবো না? আমার সঙ্গে খেলছো।

প্রদীপ ॥ বাঃ তাই না কি।

রাত্রি ॥ নয় তো কি! 'বল'টা হ'লাম আমি—'ফুট্'টা হ'ল তোমার—

প্রদীপ ॥ রাত্রি।

রাত্রি ॥ আমি এতটুকু মিথ্যে বলিনি প্রদীপদা—কথাটা মনে ভেবে দেখ!

সুহাসিনী চা ও খাবারের প্লেট নিয়ে এলেন

প্রদীপ ॥ (খাবার দেখে) চা না হয় খাচ্ছি। টা—নয়। আর কিছু খাবার সাধ্য আমার নেই।

সুহাসিনী ॥ বেশী তো কিছু নয়—সামান্য একটু !

রাত্রি ॥ সামান্য বলেই চলবে না মা।

প্রদীপ ॥ না-না—সে কি ? একথা তুমি কেন বলছো, আমি কি তোমাদের এখানে কোনদিন খাই নি ?

সুহাসিনী ॥ তা' খেয়েছো বৈ কি বাবা—সেই সাহসেই তো—

রাত্রি ॥ তুমি জান না মা—প্রদীপদার সে-দিন আর নেই। আজ তাঁদের বাড়ী গিয়ে দেখি বিরাট এক চায়ের আসর—হোমরা-চোমরা কত সব বড়লোক। পরে অবশ্য বুঝতে পারলাম তাঁরা হচ্ছেন গিয়ে পাত্রী পক্ষ—অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা, একসঙ্গে প্রদীপদা'র হাতে তুলে দিতে চাইছেন—তারপর আর এসব চলে কি মা ?

সুহাসিনী ॥ তবে থাক্। ভরা পেটে কিছু না খাওয়াই ভাল।—আমার হ'য়েছে জ্বালা—এক একজন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়—রাজ্যের ভাবনা এসে জ'ড় হয় আমার মাথায়—ক'লকাতা সহর পথঘাট তো নয়, মরণের ফাঁদ !

রাত্রি ॥ কেন ? জয়ন্তীদেবী এখনো অফিস থেকে ফেরেন নি বুঝি ? বাবা ফিরেছেন তো ?

সুহাসিনী ॥ তিনি ফিরেছেন—কিন্তু জয়ন্তী ফিরছে না কেন ? মাইনে পেয়ে সবার আগে ফেরে সে—আজ এত দেরী কেন, ভেবে পাইনে। তোরা ব'স্—আমি রান্নাঘরটা দেখি।

খাবারের প্লেট নিয়ে অন্দরে চলে গেলেন

রাত্রি ॥ তা' চা-ও তো খেলে না প্রদীপদা ! কি ভাবছো ?

প্রদীপ ॥ এই চায়ের কথাই ভাবছি। সমাজটা আজ এমনি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে মনের কথা খুলে বললেই প্রলয়—

রাত্রি ॥ চায়ের পেয়ালা থেকে একেবারে প্রলয়—ওরে বাবা, সে আবার কি ?

প্রদীপ ॥ আজ আমাদের ওখানে যা খাওয়া-দাওয়া হ'য়েছে—তা'তে আর

এক পেয়ালা চা খাওয়া—এ একেবারে অসাধ্য। শুধু আমার কেন—তোমারও। কিন্তু তবু এ চা আমাকে খেতেই হবে। যদি না খেয়ে চ'লে যাই, তবে প্রলয় হবে কি না, বলো! Yes! Tempest in a Tea pot?

রাত্রি ॥ তুমি খেয়োনা প্রদীপদা। কে তোমাকে খেতে বলেছে?

প্রদীপ ॥ ঝড়ের পুর্বাভাষ!

কথাটা শোনামাত্র রাত্রি চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে চা-টা ছুঁড়ে ফেলে দিল

প্রদীপ ॥ ঝড়! ....প্রলয়ের পুর্বাভাষ!!

রাত্রি ॥ তুমি যাবে কি না বল?

প্রদীপ ॥ প্রলয় ছাড়া আর কি!

রাত্রি ॥ এখন না গেলে প্রলয়ই হবে প্রদীপদা। আজ আর ট্রেন ধরতে পারবে না, ফলে, তোমার বড় সাহেবকে ধরে তিনমাসের ছুটি যোগাড় করতে একটা দিন যাবে পিছিয়ে, তাতে রাজকন্যাকে বিয়ে ক'রে অর্ধেক রাজত্বের মালিক হ'য়ে ক্যানাডা যাবার সব প্ল্যান হয়ত গোলমাল হযে যাবে প্রদীপদা। নাও—ওঠো। জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়।

প্রদীপ ॥ কথাটা মিথ্যে নয়, রাত্রি! তাঁদের প্রস্তাবটা এই ধরনেরই বটে! ক্যানাডায় গিয়ে সেতুবন্ধন বিদ্যেটা ভাল ক'রে শিখে আসবো—এ ছিল আগার অনেক কালের স্বপ্ন—আমার সে স্বপ্ন ওঁরা সফল করতে প্রস্তুত আছেন, আমাকে দশহাজার টাকা বরপণ দিয়ে—আমি কি করি ব'ল তো রাত্রি!

রাত্রি ॥ আর এক মিনিট দেরী না ক'রে ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সী নাও—সোজা চলে যাও হাওড়া স্টেশন—ধরো মাইথনের ট্রেন—এ ট্রেন মিস্ ক'রলে জীবনে সব কিছুই মিস্ ক'রবে প্রদীপদা'!

প্রদীপ হেসে উঠ্‌লো

প্রদীপ ॥ হ্যাঁ সব কিছুই মিস্ ক'রবো। তুমি ঠিক বলেছো রাত্রি—তুমি ঠিক বলেছো। মিস্ করবো না শুধু তোমাকে!

রাত্রি ॥ প্রদীপদা !

প্রদীপ ॥ সে মেয়েটির নাম সূর্যা। সূর্যের আলোতে প্রদীপ যায় মরে। প্রদীপ বেঁচে থাকে রাত্রির বুকে। চলি রাত্রি।

রাত্রি তার হাত চেপে ধরল

রাত্রি ॥ দাঁড়াও। এতে আমি রাজী নই। দয়া ক'রে তুমি আমাকে এত দয়া কোরো না।

প্রদীপ ॥ দয়া করে তুমি আমাকে অন্য কথা বোলো না।

রাত্রি ॥ তোমার জীবনটা এমন ক'রে মাটি কোরো না প্রদীপদা।

প্রদীপ ॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে) আমার জীবনটা এমন ক'রে মাটি কোরো না রাত্রি !

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে চ'লে গেল। রাত্রি থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভেঁপু ছিল পাশেই লুকিয়ে। এবার সে ছুটে রাত্রির কাছে এসে দাঁড়ালো

ভেঁপু ॥ আমার চকোলেট্।

রাত্রি ॥ না—চকোলেট্ নয়।

ভেঁপু ॥ বা—রে।

রাত্রি ॥ (ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটি চমৎকার গোলাপফুল বের করে) নে।

ভেঁপু ॥ (ফুলটি লুফে নিয়ে) আবে বাপ্স্। এ যে একেবারে মোহনবাগানী গোলাপ ! (প্রদীপকে ইঙ্গিত করে) আজ দিয়েছে বুঝি তোকে ছোড়দি !

রাত্রি ॥ (সস্মিত ইঙ্গিতে মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ)

ভেঁপু ॥ তোদের বিয়েটা হ'য়ে গেলে আমি বাঁচি ছোড়দি।

রাত্রি ॥ কেন বল্ তো ?

ভেঁপু ॥ লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছিলাম কি না—। কখনো দেখলাম তুই স্যুট্ করলি—প্রদীপদা খুব কষ্টে গোলটা বাঁচালো—কখনো দেখলাম

প্রদীপদা স্যুট্ করলে—তুই কোনোমতে 'বডি থ্রো'' ক'রে গোলটা বাঁচালি। শেষটা দেখলাম একটা কর্ণার কিকে তোকে গোল দিয়ে বেরিয়ে গেল—ও হল গিয়ে মোহনবাগানী চাল্—আমরা তো বলি, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে বাবা!

রাত্রি॥ ডেঁপো ছেলে! এতে বিয়ের কথা উঠ্ছে কিসে?

ভেঁপু॥ তুই যে দিদি হেরে যাবি, এ-ও আমি চাই না। বিয়েটা হ'য়ে গেলে—সে হবে একেবারে "ড্র"—মন্দের ভাল বুঝলি দিদি!

মহারাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা জয়ন্তীর প্রবেশ। ব্যক্তিত্বসম্পন্না রূপসী। বছর বাইশ বয়স। পরনে সাদাসিধে পোশাক। হাতে দুটি ভ্যানিটি ব্যাগ, একটি সাদাসিধে পুরাতন আর একটি সগুক্রীত মূল্যবান। জয়ন্তীর পেছনে তিনটে মুটে—নানারকম সাংসারিক জিনিসপত্তর বহন করে এনেছে—তার মধ্যে একটি বড় নতুন ট্র্যাঙ্কও আছে

ভেঁপু॥ এই যে বড়দি এসে গেছে। আরে বাপ্স্—এ সব কি বড়দি?

রাত্রি॥ সত্যি দিদি—ব্যাপার কি! আজ মাস পয়লা—মাইনে পেয়েছ—কিন্তু এ যে বাজার শুদ্ধ কিনে এনেছো দেখছি।

জয়ন্তী॥ হাঁ—রে রাত্রি। আজ সাধ মিটিয়ে বাজার করেছি। (মুটের মাথা থেকে চট্ করে ফুটবলের প্যাকেটটা নামিয়ে) ভেঁপু—তোমার বল। কিন্তু খবরদার! পড়াশুনোর সময় খেললে আমি ফুটো করে দেবো।

ভেঁপু বলটা পেয়ে বার দুই আনন্দে লাফাল তারপর একেবারে ফ্ল্যাট্ হয়ে মাটিতে প'ড়ে বড়দির পায়ে প্রণাম জানালো

জয়ন্তী॥ হ'য়েছে—হ'য়েছে। এখন ওঠ্ দেখি (টেনে তুললো) মালপত্তর-গুলো ভেতরে নিয়ে যা। (রাত্রিকে নতুন ভ্যানিটি ব্যাগটা দিয়ে) এটা তোর—

রাত্রি॥ একি দিদি! আজ যে দেখছি তুমি রাণী ভবানী গো!

জয়ন্তী ॥ কথা রাখ। এদের নিয়ে এখন ভেতরে মার কাছে যা' দেখি—জিনিস-পত্তরগুলো নামিয়ে গুছিয়ে রাখ।

ভেঁপু ইতিমধ্যে ফুটবলের ব্লাডারটা বের করে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে ব্যস্ত

জয়ন্তী ॥ এই ভেঁপু গেলি!

ভেঁপুর মুখ বন্ধ, সে ইশারায় মুটেদের ডেকে নিয়ে অন্দরে চলে গেল

রাত্রি ॥ ব্যাপার কি—বল না দিদি? তোমার এমন রাণী ভবানীর রূপ তো কখনও দেখিনি! আর তুমি এখানে দাঁড়িয়েই বা কেন? ভেতরে যাচ্ছ না যে?

জয়ন্তী ॥ বল্‌বো—বল্‌বো—সব বল্‌বো। এখন নয়। জিনিসপত্তরগুলো সব গুছিয়ে রেখে মা-বাবা-ভেঁপু সবাই তোরা এখানে আয়। বাজনাগুলো সব এনে আসর ক'রে বোস—যেমন মাসপয়লার রাতে আমরা বসি!—আমি দাদাকে দেখে আসি—

রাত্রি অন্দরে চলে গেল। জয়ন্তী আনন্দের ঘরের দিকে এগোতে যাবে
এমন সময় আনন্দ বেরিয়ে এল

আনন্দ ॥ তোর গলা শুনে আমার আর তর সইলো না জয়ন্তী। তুই ছাড়া আমার এসব কেউ কিছু বোঝে না।

বলতে বলতে এসে নিজেই ভাঙ্গা চেয়ারটার ওপর বসলো

আনন্দ ॥ (জয়ন্তীকে মোড়াটা দেখিয়ে) এখনা বোস্ দেখি। মাথাটা ঠাণ্ডা করে বল দেখি—"বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে হইলে অবশ্য প্রয়োজনীয় কি, প্রেম না হেম?"

জয়ন্তী ॥ (হেসে উঠ্‌লো) এ প্রশ্নের উত্তর এ বাড়ীতে একমাত্র দিতে

পারেন—হয় বাবা নয় মা।। প্রশ্নটা বরং তুমি তাঁদের জিজ্ঞেস ক'রো দাদা।

আনন্দ ॥ বিবাহ তাঁদের হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু একদিনের জন্যেও কি ওঁরা সুখী হয়েছেন যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন! দেখলাম তো তাঁদের জীবনে না আছে প্রেম, না আছে হেম।

জয়ন্তী ॥ এই দাদা চুপ। ওঁরা আসছেন।

প্রথমে মুটের দল চলে গেল। তাদের পেছনেই এলো ভেঁপু এবং রাত্রি। রাত্রি একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে দিলো উঠোনে। ভেঁপু খোলটি সেখানে রেখে অন্যসব বাজনার যন্ত্র আনতে পুনরায় ভেতরে চলে গেল। রাত্রি দাদাকে একটু সরিয়ে বসিয়ে আসর রচনার কাজে ব্যাপৃত হ'ল। জয়ন্তী গিয়ে আনন্দের ইজিচেয়ারটি টেনে এনে যথাস্থানে রাখলো। ইতিমধ্যে ভেঁপু অন্যান্য বাজনার যন্ত্র নিয়ে এসে পড়েছে, যথা :—গৃহকর্ত্রীর করতাল, আনন্দের বেহালা, রাত্রির বাঁশী এবং নিজের জন্যে একটা একতারা

আনন্দ ॥ ও—আজ মাস পয়লার আনন্দ—আসর! কিন্তু তোড়জোড়টা আজ একটু বেশী মনে হচ্ছে—জয়ন্তী।

রাত্রি ॥ তুমি তো দেখনি দাদা—আজ দিদি মাসের গোটা মাইনেটাই খরচ করে বাজার শুদ্ধু কিনে এনেছে আমাদের জন্যে।

আনন্দ ॥ (জয়ন্তীকে) সে কি রে!

জয়ন্তী ॥ চিরকালই কি আমরা দুঃখে থাকবো। একদিনও কি আমরা প্রাণভরে একটু আনন্দ করবো না দাদা!

আনন্দ ॥ কিন্তু গোটা মাস পড়ে রইলো। খাবি কি?—চলবে কিসে?

জয়ন্তী ॥ সে পাজ্‌ল্‌টা তুমিই solve করেছ দাদা। সবাই আসুক—বলছি।

মহারাজের প্রবেশ

মহারাজ ॥ ব্যাপার কি রে খুকী!

জয়ন্তী ॥ খুকী বললে তো আমি জবাব দিই না বাবা !

মহারাজ ॥ ও—তুই ধরিস না মা। এই তো আমি মহারাজ মিত্র। সবাই ডাকছেও মহারাজ বলে—হ্যাঁ মনে মনে হাসিও বটে! কিন্তু উত্তর তো দিই। ঐ যে তোমার মা আসছেন—নাম হ'ল গিয়ে সুহাসিনী। হাসলেন কবে ? হাসতে দেখেছো কখনো ? কিন্তু ডাকবে সুহাস —উত্তর দেবে ঠিকই !

সুহাসিনীর প্রবেশ

সুহাসিনী ॥ হ্যাঁরে খুকী—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে। পুজোর বাজার করে এনেছিস যে! বেনারসী শাড়ি আবার আমি কবে পরি যে তুই এনেছিস্ আমার জন্মে।

মহারাজ ॥ পঁচিশ টাকা পনের আনা দিয়ে আমার জন্মে জুতো কিনে এনেছিস্। আমায় এ জুতো তুই কেন মারলি মা ?

আনন্দ ॥ এ দেখছি Crossword Puzzle-এর বাবা।

জয়ন্তী ॥ ভেবেনো দাদা—এখনই solve করে দিচ্ছি। তোমরা সবাই যার যার জায়গায় আসরে ব'স। ভেঁপু—সদর দরজা দিয়ে আয়। (ভেঁপুর তথাকরণ) টুংটাং সুরু ক'র। আমি চোখেমুখে একটু জল দিয়ে কাপড়টা বদ্‌লে আস্‌ছি।

একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘট্‌লো—জয়ন্তী অন্দরে যাচ্ছিল—হঠাৎ মহারাজ মিত্র রুদ্রমূর্তিতে তার হাত চেপে ধরলো

মহারাজ ॥ চরিত্র নষ্ট করেছিস্ তুই। কারো কাছ থেকে এ টাকা তুই পেয়েছিস্। মাইনের টাকা তুই খরচ করিস নি—সে আমি জানি। কারণ তুই ভাল করেই জানিস তোর আমার দুজনের বেতনেও এ সংসার চলে না।

জয়ন্তী ॥ চরিত্র নষ্ট করেছি আমি !

মহারাজ ॥ হ্যাঁ করেছিস্। তোদের আফিসের সেই বড় সাহেব—তার সঙ্গে তোর প্রেম চলছিল। গরীব হলেও আমি সব বুঝি। তুই তাকে বিয়ে করতে ক্ষেপে উঠ্‌লে কি হবে? তোকে আমি কতদিন বলেছি—বড়লোকেরা বড় ঘরেই বিয়ে করে—গরীবের মেয়ে বিয়ে করে না—গরীবের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের খেলাই খেলে! তোর বড় সাহেবের সেই টোপ্‌ তুই গিলেছিস্। এ টাকা—সেই টাকা।

জয়ন্তী ॥ (এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমার ঘেন্না হচ্ছে। মা!—তোমাকে আমি বলছি—বাবার ও কথা এতটুকু সত্যি নয়। (Vanity Bag খুলে Crossword Puzzle-এর একটা ছাপানো নোটিশ বের করে আনন্দের হাতে দিয়ে) Crossword Puzzle তুমিই Solve করেছ। এ Puzzle-টাও Solve কর তুমি—দাদা।

ছুটে অন্দরে চলে গেল

আনন্দ ॥ (কাগজটা দেখে) এ কি! (নোটিশটি পাঠ) "২১৩ নম্বর জন মঙ্গল শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিতায় একমাত্র নির্ভুল উত্তর দিয়া শ্রীমীত জয়ন্তী মিত্রের বিশ হাজার টাকার প্রথম পুরস্কার লাভ। আরও পঞ্চাশ ব্যক্তির অন্যান্য পুরস্কার লাভ। নিম্নে তাহাদের নাম ও পুরস্কারের পরিমাণ ঘোষিত হইল। আগামীকল্য বিকাল ৩টায় হেড অফিসে পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।"

সকলে ॥ এ্যাঁ!

বল কি—

দেখি কাগজটা দেখি—

আর একবার পড় তো—

মহারাজ ॥ আমার চশমাটা—আমার চশমাটা—

ভেঁপু ॥ Three cheers for Mohunbagan—Hip—Hip Hurrah ! Hip—Hip—Hurrah !

সময়ক্ষেপণ সূচক অন্ধকার নেমে এলো মঞ্চের ওপর—মঞ্চ যখন আবার আলোকিত হ'ল তখন দেখা গেল একে একে এই পরিবারের লোকগুলি গানের আসরে সমবেত হচ্ছেন। বেশ ভাল একটা ভোজ খেয়ে উঠেছেন এই রকম একটা চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে সকলেরই চেহারায়। ভেঁপু পানের রেকাবীতে পান এনে সকলকে পান দিচ্ছে। রাত্রি তামাক সেজে এনে হুঁকোটি মহারাজকে দিল। বাজনাগুলোর সমাবেশ করে যথাস্থানে সকলকে বসাবার উদ্যমও দেখা গেল রাত্রির।

মহারাজ ॥ এত বড ভোজের পর এখন এসব গান বাজনা—এসব কি আর পারবো ? তোরা সুরু কর—আমি বরং এখানেই একটু গড়াগড়ি দেই—

রাত্রি ॥ না বাবা তা হবে না। মাসপয়লায় আমাদের আনন্দের আসর—কতদিনের এ নিয়ম—এ আমরা ভাঙবো না। বিশেষ করে আজ।

মহারাজ ॥ আমি কি না বলছি ? খোল না বাজিয়ে যদি আমি চোখ বুজি—বাজনা আমার বাজবেই—নাকের বাজনা—

সুহাসিনী ॥ না না রক্ষে ক'রো। তুমি নাক ডাকাতে সুরু করলে সব বাজনা যাবে তলিযে। সে সব চলবে না। আজ এমন দিনে ঠাকুরকে আমরা সবাই ডাকবো—মনে প্রাণে ডাকবো। তাঁর এত দয়া !

জয়ন্তী ॥ দয়াটা ঠাকুরের সন্দেহ নেই। পুরস্কারটা আমার নামে উঠেছে এটাও সত্যি কিন্তু যে লোকটি সমস্যার সমাধান করেছেন তাঁকে যেন আমরা না ভুলি। তিনি হচ্ছেন আমার লক্ষ্মী দাদাটি—

আনন্দকে আদর করলো

আনন্দ ॥ বুঝলে মা—Puzzle-টা Solve করে আমি বুঝতে পারলাম এ Prize আমি মারবোই। কিন্তু ভেবে দেখলাম T. B.-র সৌভাগ্য যার হয়েছে তার ভাগ্যে এ শিকে ছিঁড়বে না।। তাই সমাধানটা

খুকীকে দিয়ে বললাম, আমার ভাগ্যে ঢের হয়েছে এবার তোর বরাতটা দেখ্।

ভেঁপু ॥ মানে বড়দা তুমি বলটা চট্ করে পাস্ করে দিলে আর বড়দিও সঙ্গে সঙ্গে স্যুট্। (লাফিয়ে চিৎকার) গো···ল।

জয়ন্তী ॥ (ভেঁপুর চিবুক ধরে আদর করে) গোল—হ্যাঁ সত্যিই গোল। আমরা বোধ হয় এই প্রথম গোল দিলাম—আর জীবনের knock-out-এ জিতলাম। কিন্তু এ জয় কোন জয়ই নয় দাদা যদি তুমি না বাঁচ। তুমি আমাদের জীবনের আনন্দ। তৈরী হও দাদা। টাকায় কি না হয়। কোন্ Sanatorium-এ তুমি যাবে বলো—কোন্ ডাক্তারের চিকিৎসায় তুমি থাকবে বলো। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। আমাদের জন্য তোমাকে বাঁচতে হবে।

আনন্দ ॥ দূর—দূর! গাছের গোড়া কেটে জল দিলে, গাছ কি আর বাঁচে! যদি আমি বাঁচি—আমি আমার এই মায়ের, এই বোনের, ঐ বাবার, ঐ ভায়ের sanatorium এই—বাঁচবো। তুই আমার জন্য ভাবিস নি। বাবা মা আমার নাম রেখেছিলো আনন্দ—T. B.-র সাধ্য কি আমার সে নাম—সে আনন্দ কেড়ে নেয়! এসব কথা থাক্—এখন বল দেখি "মানুষের জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন কি—অশন না বসন?"

জয়ন্তী ॥ অশনও নয় বসনও নয়—দরকার শাসন। কারণ—তুমি আমাদের কথা শোন না, চল দাদা—শোবে চল।

আনন্দকে জোর করে ধরে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল

সুহাসিনী ॥ বাড়ী ছেড়ে আনন্দ কিছুতেই কোনখানে যাবে না। বাড়ীতেই সবচেয়ে বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা হোক্।

মহারাজ ॥ সবচেয়ে আগে দরকার ওর জন্য একটা ভাল ঘর করে দেওয়া।

রাত্রি ॥ তা ঠিক বাবা। ও আবার একটা ঘর না কি। যে দেখে সেই ঠাট্টা করে—বলে ওটা আঁতুর ঘর না—গোয়াল!

মহারাজ ॥ ওর বেশী তো আর সাধ্য ছিল না মা ! এখন যখন সাধ্য হ'য়েছে আমি বলি ঘরটা ভেঙ্গে দোতলা ঘর তোলা হোক্। মনের মত আলো হাওয়া পেলেই আনন্দ আমার হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

সুহাসিনী ॥ তাতে কত খরচ পড়বে ?

মহারাজ ॥ তা' হাজার দশেক।

সুহাসিনী ॥ বেশ তো, তবু তো দশ হাজার থাকবে—তা'তে আমার দুই মেয়ের বিয়ে কোনমতে হ'তে পারে—কি বল ?

মহারাজ ॥ তা' হয়ত হ'ত—কিন্তু হবে কি ? দেনা শোধ দিতে হবে না ?

সুহাসিনী ॥ কত টাকা দেনা ?

মহারাজ ॥ তা' প্রায় পাঁচ হাজার—

সুহাসিনী ॥ দেনা শোধ এখন থাক্। মেয়েদের বিয়েই আগে হোক্।

মহারাজ ॥ বাড়ীটা বাঁধা রয়েছে যে গিন্নী ! তা' বেশ তো—মেয়ের বিয়েই আগে হোক্ ! তারপর পথে বসতে হয় বসবো।

রাত্রি ॥ না—না বাবা, আমাদের বিয়ে এখন থাক্।

সুহাসিনী ॥ আচ্ছা আনন্দের ঘরটা যদি দোতলা না করে একতলাই করা হয়—খুব বড় দরজা-জানালা রেখে—তবে বোধ হয় পাঁচ হাজারেই হয়—কি বল ?

মহারাজ ॥ না-না, এ টাকা আনন্দেরই উপার্জন। তার যাতে আনন্দ হয়—সেটা আমরা দেখবো না !

সুহাসিনী ॥ কিসে তার আনন্দ—আমার চেয়ে তোমরা বেশী জান না। তোমরা কে কতটুকু তার কাছে থাকতে পার। থাকি আমি—তাই আমি জানি। এক আনন্দ, তার ঐ Crossword Puzzle—রাতদিন রাজ্যের যত প্রশ্ন—সেইসব চিন্তা করা আর তার উত্তর বের করা—এই তো ওর আনন্দ। আর এক আনন্দ—ঐ মাধবীলতার গাছটি—ঐ গাছটির সেবা যত্ন। এদুটি বাদ দিয়ে যদি ওকে সাততলা বাড়ীতেও রাখো—ও বাঁচবে না।

রাত্রি ॥ মাধবীলতা গাছটি দাদার শুধু আনন্দ নয়—দাদার প্রাণ। ওর একটি পাতা যেদিন খসে পড়ে, দাদার 'টেম্পারেচার' যায় বেড়ে। এই শরীর নিয়ে নিজে ওর মাটি আলগা করবে, গোড়ায় ঢালবে জল। আমরা দিতে গেলে বলবে— 'না—না তোরা জানিস না'। ঐ গাছে ফুল ফুটবে—এই হ'ল গিয়ে ওর পণ। আর সে পণ কেন তা' তোমরা জান না—জানি আমি।

মহারাজ ॥ কি ?

রাত্রি ॥ ডাক্তারের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসে দাদাকে দেখতে—ডাক্তারের মেয়ে সুনন্দা। ডাক্তারবাবু "ভিজিট" নেন—তাতে সুনন্দা একদিন হেসে বলেছিল, আনন্দবাবু—আমায় "ভিজিট" দিলেন না ? দাদা বলেছিল—'কি "ভিজিট" দেব বলুন ?' সুনন্দা বলেছিল, আপনার ঐ মাধবীলতার প্রথম ফুলটি—বলেই হেসে উঠেছিল সুনন্দা। কেন জান ?

মহারাজ ॥ কেন ?

রাত্রি ॥ মাধবীলতার গাছটি ছিল তখন মর' মর' বাঁচবার তার কোন লক্ষণই ছিল না। সুনন্দার মনে কি ছিল কে জানে—সেই থেকে সেও আর আসে নি। কিন্তু সেই থেকে দাদারও ধনুকভাঙ্গা পণ —'ফুল আমি ফোটাবোই'।

ঘর থেকে জয়ন্তী বেরিয়ে এল

মহারাজ ॥ বয়সকালে উপন্যাসেই এসব পড়তাম বটে। কি বল গিন্নী ?

সুহাসিনী ॥ তুমি এসব বুঝবে না। শোন্ খুকী—টাকাটার কি করবি বল তো ? আনন্দের জন্যে দোতলা ঘর করতে গেলে তোদের বিয়ে হয় না—তোদের বিয়ে দিতে গেলে দেনা শোধ হয় না—। টাকা যখন ছিল না—তখন অভাবটা এত বুঝি নি—আজ যত বুঝছি।

মহারাজ ॥ তা' ঠিক। এ যেন নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি এমন থাকতো যার হাতে টাকাটা তুলে দিয়ে বলতে

পারতাম—এই নাও মশাই—আমার যা ছিল সব দিলাম। এইবার আমার ছেলে মানুষ কর, মেয়ের বিয়ে দাও, অসুখ বিসুখে ওষুধপত্র দাও—সবাইকে খেতে পরতে দিয়ে একটু ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখো। আমার যা আছে সব নিয়ে আমাকে দায়দৈন্য থেকে রেহাই দাও—আমায় একটু আনন্দে বাঁচতে দাও। তা' এ জন্মে আর হবে না। নাও, ঘোরাও ঘানি—ধরো গান—করো আনন্দ—

সুহাসিনী ॥ আনন্দ কিছু বাকি নেই—এত আনন্দে ঠাকুর প্রণামটুকুও আমরা ভুলে গেছি। ঠাকুর ঘরে প্রণাম সেরে এসে, তবে বসুক তোমাদের আনন্দের আসর—

মহারাজ ॥ তা ঠিক্—তা ঠিক্—

মহারাজ ও সুহাসিনী যথাক্রমে খোল ও করতাল তুলে নিলেন এবং বাকী সবাই হাতে তালি দিয়ে "পার করো হে দয়াময়" জাতীয় একটা কীর্তন গাইতে গাইতে অন্দরে চলে গেল—সবার পেছনে ছিল জয়ন্তী। জয়ন্তীও অদৃশ্য হচ্ছিল এমন সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। জয়ন্তী ফিরে দাঁড়ালো—চলে গেল সদর দরজায়—দরজা খুলে দিল—ভেতরে এলেন একজন হব্যভব্য পোশাকপরা অফিসার জাতীয় ভদ্রলোক। জয়ন্তী তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে এলো

জয়ন্তী ॥ আসুন—কাকে চাইছেন?

অফিসার ॥ শ্রীমতী জয়ন্তী মিত্রকে। এইটেই তো ২৭।৩, নবাব বাহাদুর রোড্?

জয়ন্তী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—আর আমারই নাম জয়ন্তী মিত্র। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

অফিসার ॥ জনমঙ্গল শব্দসন্ধান প্রতিযোগিতার ক'লকাতার হেডঅফিস থেকে—আমার নাম শ্রীগদাধর দত্ত—লোকে অবশ্য আমাকে জি. ডি. ডাট বলেই জানে।

পকেট থেকে বিশেষ কায়দায় একটা কার্ড—জয়ন্তীর হাতে দিল

ওঃ—আপনার এই বাড়ী খুজে বের করতে যা' কষ্ট হয়েছে—কি

আর বলবো! তবে আপনাকে খুঁজে বের করতে পেরেছি—সব কষ্ট সার্থক হ'ল।

জয়ন্তী ॥ দয়া ক'রে বসুন। এত রাত্রে এত কষ্ট করে কেন আপনি এলেন? আপনাদের ঘোষণা তো আমি পেয়েছি!

গদাধর ॥ আরে ঐ ঘোষণার জন্যেই তো আসতে হ'ল এত কষ্ট ক'রে এই ধপ্‌ধপা গোবিন্দপুরে! ম্যানেজার সন্ধ্যে ছ'টায় আমাকে জরুরী তলবে ডেকে হুকুম দিলেন—বুঝলে ডাট্‌, যেমন করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে—আজই রাত্রে—সে যত রাতই হোক—এই জয়ন্তী মিত্রকে। তা, আমি বলেই পারলাম। কোম্পানির প্রেষ্টিজ রাখতে কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করে না জি. ডি. ডাট্‌।

জয়ন্তী ॥ ধন্যবাদ। আপনার শুভাগমনের উদ্দেশ্যটা জানবার সৌভাগ্য এখনো হয় নি। আমি আপনাদের শব্দসন্ধান প্রতিযোগিতায় বিশ হাজার টাকার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি তা' জানি। কাল বিকেল পাঁচটায় হেড অফিসে টাকা দেওয়া হবে তাও জানি। আর কিছু জানবার আছে কি? থাকে তো দয়া করে শীগ্‌গির বলুন। আমাদের পারিবারিক উপাসনায় আমি যোগ দিতে পারছি না—

গদাধর ॥ পুরস্কারের ঘোষণা শুনেই এই সব পুজোটুজো হচ্ছে। সে কি আর আমি বুঝছি না। হিন্দু বাড়ীতে এসব হয়েই থাকে। লোকে পাশ করলে পুজো দেয়—আমি B A. ফেল করলাম তাও আমার মা কালীঘাটে পাঁঠা দিলেন—বললেন 'B. A. ফেল সেই বা কম কি—I. A. পাশের চেয়ে তো ঢের বেশী—

জয়ন্তী। (ধৈর্যচ্যুত হ'য়ে) দেখুন এই রাত দশটায় আপনার গালগল্প শোনার মত সময়ও নেই—ধৈর্যও নেই আমার। যদি নতুন কিছু বলবার থাকে বলুন—নইলে নমস্কার।

গদাধর ॥ আপনি তাড়িয়ে দিলেও আমাকে আমার কর্তব্য সম্পাদন ক'রে যেতেই হবে শ্রীমতী জয়ন্তী মিত্র। আপনি হয়ত মনে করছেন

রাতদুপুরে আমি আপনার ফটো নিতে এসে আপনাকে বিরক্ত করছি—

জয়ন্তী ॥ না—আমি তা' মনে করছি না। আমার চোখ আছে—আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনার সঙ্গে কোন ক্যামেরা নেই।

গদাধর ॥ তা' ঠিক। কিংবা হয়ত ভাবছেন—আমি হয়ত আপনার কাছে কিছু কমিশন চাইতে এসেছি। না—না, আপনি জানেন না—এমন অনেক ভুঁইফোঁড় কেম্পানি আছে—যারা এমন চায়। Beware of them, Miss Mittra !

জয়ন্তী। আপনি বেরিয়ে যান বলছি !

ডাট্ সাহেবের এইবার চৈতন্য হল। খানিকটা বিনীত হ'য়ে সে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করলো।

গদাধর ॥ যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। যে কাজে এসেছি তা' সারতে আমার এক মিনিটও লাগবে না। কোম্পানীর এই চিঠিটা দয়া ক'রে দেখুন।

পত্রটি জয়ন্তীর হাতে দিল

জয়ন্তী ॥ (চিঠিটা নিয়ে) ধন্যবাদ—আপনি এখন যেতে পারেন।

গদাধর ॥ না—না, আপনি দয়া করে ওটা এখনি পড়ুন। ওতে এমন সব ব্যাপার আছে•যার মৌখিক উত্তর দিতে হবে আমাকে—ক্ষমাও চাইতে হবে আমাকে। বড়ই সব অপ্রীতিকর ব্যাপার হবে কি না—তাই—

জয়ন্তী ॥ (চিঠিটা এর সামনে পড়বে কি পড়বে না ভেবে শেষে পড়াই ঠিক করলো—চট্ ক'রে খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠি পড়ে—) সে কি ! আমি তবে পুরস্কার পাই নি !!

গদাধর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—

জয়ন্তী ॥ তবে আপনাদের ঘোষাণায় ছাপা হল কেন ?

গদাধর ॥ নামটা ছাপতে ভুল হয়নি শ্রীমতী মিত্র। ভুল হ'য়েছ ঠিকানায়—

জয়ন্তী ॥ তার মানে ?

গদাধর ॥ তার মানে প্রতিযোগীদের মধ্যে দুজন ছিলেন জয়ন্তী মিত্র। তিনজন থাকলেও আমি অবাক হতাম না—কারণ এ নামটা আজকাল খুব ফ্যাশন। সত্যি সত্যি Prize যিনি পেয়েছেন সে জয়ন্তী মিত্রের ঠিকানা—৭২, পাঁচু খানসামা লেন—ভুলে ছাপা হয়ে গিয়েছে আপনার ঠিকানা ২৭।৩, নবাব বাহাদুর রোড্। খানসামা হয়েছে নবাব !

জয়ন্তী ॥ আপনি চলে যান। দয়া করে আপনি এখনই চলে যান।

গদাধর ॥ এই মারাত্মক ভুলের জন্যে কোম্পানি অবশ্য আপনার কাছে এই পত্রে ক্ষমা চেয়েছেন—আপনি পড়েছেন নিশ্চয়ই। না—না, আমাকে আবার মৌখিক ক্ষমা চাইতেও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জয়ন্তী ॥ আমি আপনার পায়ে পড়ছি মিঃ দত্ত—আমার বাড়ীর লোকজন এখানে আসবার আগে আপনি দয়া করে চলে যান। জীবনে এই একটি দিন ওরা আনন্দ করছে—এটুকু আনন্দে আপনি আর বাদ সাধবেন না !

গদাধর ॥ না—না, আমি যাচ্ছি। আপনি শুধু বলুন যে আপনি আমাদের ক্ষমা করেছেন !

জয়ন্তী ॥ করেছি আমি—ক্ষমা করেছি আমি—

গদাধর ॥ আঃ বাঁচলাম ! আমি চলি। এইবার আপনি ওদের সঙ্গে যত পারেন আনন্দ করুন। নমস্কার।

গদাধরের প্রস্থান। মর্ম্মাহত হলেও গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল জয়ন্তী—বন্ধ ক'রে দিয়ে এল দরজাটা। ইতিমধ্যে কীর্তন গাইতে গাইতে অন্দর থেকে পারিবারিক দলটি আসরে এসে দাঁড়াল। রাত্রি ও ভেঁপু যথাক্রমে বাঁশী ও একতারা তুলে নিল। জয়ন্তী ছুটে গিয়ে বেহালাটি তুলে নিয়ে তাদের সঙ্গে বাজাতে সুরু করলো। এতে সকলের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল—সকলে আসরে

বসে কীর্ত্তনটি আরও প্রাণবন্ত ক'রে তুললো। জয়ন্তী মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে আসরের মধ্যমণি হ'য়ে বেহালা বাজিয়ে চলেছে যেন জন্মের মত। এরই মধ্যে আর একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো কিন্তু এরা সকলে এই কীর্তনে এতটা মত্ত ও বিভোর হয়েছিল যে, সে ঘটনার প্রতি কারও নজর পড়লো না। ঘটনাটি আনন্দের উপস্থিতি। আনন্দ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জলসেচন পাত্র হাতে—কি এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তার আনন—চোখ দুটি সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর। জল সেচন পাত্র হাতে নিয়ে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মাধবীলতার গাছটার দিকে। নীচু হযে গাছের গোড়ায় জল দিতে গেলেই বুকে কি একটা ব্যথা অনুভব ক'রে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠ্‌লো আনন্দ। হঠাৎ আর্তনাদ শুনে থেমে গেল কীর্তন—সকলে ছুটে এলো আনন্দের কাছে।

সুহাসিনী ॥ এ কি বাবা—একি!

মহারাজ ॥ কি হ'য়েছে বাবা!

আনন্দ ॥ বুকের সেই ব্যথাটা—হঠাৎ উঠ্‌লো।

সুহাসিনী তাড়াতাড়ি তার মাথাটা কোলে তুলে নিলেন—জয়ন্তী তার বুকে হাত বোলাতে লাগলো—রাত্রি ছুটে গিয়ে পাখা নিয়ে এসে হাওয়া করতে লাগলো—ভেঁপু ঘরে গিয়ে একটা বালিশ নিয়ে এসে আনন্দের মাথার তলায় দিয়ে দিল। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় মহারাজ একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। বলাবাহুল্য যে, আনন্দের চোখেমুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

সুহাসিনী ॥ এ তুই কি করলি বাবা! রাতদুপুরে কেউ কখনো গাছে জল দিতে আসে!

আনন্দ ॥ কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলাম না মা। কেবলই মনে হচ্ছিল কি যেন একটা ভুল হয়েছে। হঠাৎ মনে হ'ল মাধবীলতার গাছে জল দিতে ভুলে গেছি। তাই না উঠে এলাম!

হাসিনী ॥ কেন এলি বাবা?

আনন্দ ॥ কেন এলাম? আমার মনে হয় এ বাড়ীতে তোমরাও যেন সব এক একটি গাছ—সমযমত কারও যত্ন হ'ল না। না পেলে সার—না

পেলে জল। তাই এ বাগানে কোনও ফুলই তো ফুটলো না মা। (থেমে) মাধবীলতায় ফুল চাইব—আর জল দেব না। ওঃ আঃ।

সুহাসিনী ॥ তোর এ কষ্ট আর দেখতে পারি না বাবা।

আনন্দ ॥ এ আর কি কষ্ট মা। তোমাদের কপালে যে কষ্ট—যে যন্ত্রণা আজ রয়েছে সে কথা ভেবে আমি আকুল হচ্ছি মা।

মহারাজ ॥ তুই যদি বেঁচে থাকিস আনন্দ, সব দুঃখ কষ্ট আমরা হাসিমুখে সহ্য করতে পারবো বাবা।

আনন্দ ॥ পারবে বাবা ? পারবে মা ?

সুহাসিনী ॥ তা' কি তুই দেখিসনি বাবা ? তুই বেঁচে থাকলে কোন কষ্টই আমাদের কষ্ট নয়।

আনন্দ ॥ নয ? (থেমে) তবে শোন মা, শোন বাবা। রাত্রি, ভেঁপু, তোরাও শোন্—তোরা জানিস্ জযন্তী বিশ হাজার টাকা প্রাইজ পেযেছে—

জয়ন্তী ॥ (আর্তকণ্ঠে) দাদা—

আনন্দ ॥ জানি জয়ন্তী, জানি। অন্ধকারে শুয়ে ছিলাম, তোব জি. ডাটেব সব কথাই আমার কানে গেছে। বুঝলে বাবা, বুঝলে মা—তোমরা যখন ঠাকুর ঘরে ভজন গাইছিলে, শব্দসন্ধান অফিস থেকে লোক এসে জানিযে গেছে পুরস্কারটা আমাদের জযন্তী পাযনি—পেয়েছে আর এক জযন্তী—মানে ঠিকানাতে হযেছিল ভুল।

সুহাসিনী ॥ সে কি ?

মহারাজ ॥ বলিস কি বাবা ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ বাবা। দেখছোনা জয়ন্তীর চোখে জল। এ কথা শুনে, বল বাবা, বল মা, আমার এই বুকের যন্ত্রণার চেয়ে তোমাদেব মনের এই যন্ত্রণা বেশী কিনা বল—

সুহাসিনী ॥ না না আমাদের এ যন্ত্রণা কোন যন্ত্রণা নয়—এ আমাদের গা সহা হয়ে গেছে—বাবা।

মহারাজ ॥ তা' নয় তো কি? এই জয়ন্তী—খবরদার কাঁদবিনে। বাপের বেটী যদি হোস কাঁদবিনে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এমন সব ঘটনা আমার জীবনেও কত ঘটেছে। এই ধর আমার বিয়ে। শোন তবে আজ বলি। ধল দিঘির জমিদারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হ'ল—পাকা দেখা—আশীর্বাদ সব হ'য়ে গেল। জমিদারের ঐ একটি মাত্র সন্তান—তার মানে যে কি তা' বুঝতে পারছিস তো? মানে মহারাজ মিত্র সত্যি সত্যি মহারাজ হ'ত—এই আর কি। তা' বিয়ের তিনদিন আগে জমিদারের ঐ সবেধন নীলমণি—সাপের কামড়ে মারা গেল। তা যাক্। তা ভালই হ'ল।—তবেই না তোদের মা এই সুহাসিনী দেবীর হাসিতে আমার ঘর ঝলমল হ'য়ে উঠলো। কাঁদিসনে, কাঁদিসনে—জয়ন্তী, আয় মা—আমার বুকে আয়।

জয়ন্তীকে বুকে লইলেন

আনন্দ ॥ এতক্ষণে আমার বুকের যন্ত্রণাটা বুঝি গেল মা।

সুহাসিনী ॥ সত্যি, বাবা সত্যি?—

আনন্দ ॥ হ্যাঁ মা, সত্যি। এই তো—তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে মা!

সুহাসিনী ॥ তোদের মুখে হাসি থাকলে আমার হাসি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না বাবা। কিন্তু আর রাত নয়—এবার তুমি শুয়ে পড় বাবা। রাত্রি,, জয়ন্তী, হাঁ করে তোরা দেখছিস কি? আনন্দের বিছানা ঠিক করে দে। এই ভেঁপু শুতে যা—

আনন্দ ॥ এই ভেঁপু শোন্—ব্যাপারটা কি হ'ল বুঝলি?

ভেঁপু ॥ কেন বুঝব না দাদা—দিদি মোহনবাগানের হয়ে অনেক কষ্টে ইষ্টবেঙ্গলকে একটা গোল ঠুকে দিয়েছিল—রেফারী সেটা disallow করে দিল।

মহারাজ ॥ সাবাস বেটা সাবাস। মোহনবাগান এখন কি করবে ভেঁপু?

ভেঁপু ॥ মোহনবাগান এসব থোড়াই কেয়ার করে—উঠে পড়ে লেগে আবার একদিন গোল দিয়ে দেবে।

মহারাজ ॥ (উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া) আমরাও দেবো—আমরাও দেবো—গোল একদিন আমরাও দেবো।—নাও, রাত অনেক হয়েছে—এখন সব শুয়ে পড়।—

হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম—হরে রাম—রাম রাম হরে হরে।

সকলেই মহারাজ মিত্রের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ মিশাইল। যবনিকা নামিল।

'মধ্যবিত্ত'
শারদীয়া সংখ্যা
১৩৬৩।

কামধেনু কবচ

বালিগঞ্জ। "সিংহ-কুটির" নামক একটি সুরম্য গৃহ। সুরম্য গৃহের একতলস্থ মনোরম উপবেশন কক্ষ। গৃহস্বামী লক্ষপতি ব্যবসায়ী—নাম প্রতাপচন্দ্র সিংহ। সকাল সাতটা। একটি চেয়ারে শ্রীযুত সিংহের প্রচারবিদ (পাবলিসিটি অফিসার) শঙ্খ সরকার বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছে। গৃহভৃত্য দশরথ ফুলদানির পুরাতন ফুলগুলি বদলাইয়া নূতন ফুল সাজাইতে আসিল।

দশরথ॥ নমস্কার শাঁখবাবু। এত সকালে?

শঙ্খ॥ দ্যাখো দশরথ, তোমাকে অনেকবার বলেছি, তুমি আমাকে শাঁখবাবু বল্‌বে না—আমার নাম শঙ্খ সরকার।

দশরথ॥ ও আমার মুখে বেরুবে না বাবু। আপনি যখন প্রথম চাকরি নিলেন, তখন আমি কর্তাকে শুধালাম, কিসের চাকরি—কর্তা বললেন—ও আমার শাঁখ বাজাবে—আমি তো অবাক!

শঙ্খ॥ অবাক হবার কিছু নেই। আমি কর্তার পাবলিসিটি অফিসার—বিজ্ঞাপনের শাঁখে ফুঁ দিয়ে, তোমাদের কর্তার ব্যবসা ফাঁপিযে দিচ্ছি আমি। তাই বলে শাঁখ আমার নাম নয়। আমার নাম শঙ্খ সরকার, তুমি আমাকে শাঁখবাবু না ব'লে, বরং ব'লো সরকার বাবু। কিন্তু দশরথ, আর কতক্ষণ ব'সে থাক্‌ব!—কর্তা নামবেন কখন?

দশরথ॥ কর্তার ঘুম ভাঙে আটটায়—আর এখন তো সাতটা।

শঙ্খ॥ কি বিপদ! আমারই কি ঘুম ভাঙে সাতটায়! কিন্তু কর্তা নিজে হুকুম দিয়েছেন কাল, সকাল সাতটায় আসতে হবে আজ।

প্রতাপসিংহ উপবেশন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গায়ে একটি কিমানো।

সিংহ॥ যাক্, ঠিক সময়েই এসেছ শঙ্খ। দশরথ, চা—

দশরথ ॥ দিচ্ছি হুজুর।

দশরথ ভিতরে চলিয়া গেল

সিংহ ॥ আমি আজ ন'টার প্লেনে দিল্লী চলে যাচ্ছি। বস্তি-উন্নয়নের জরুরী মিটিং সেখানে। দু-চার দিন দেরী হবে। তাই যাবার আগে,—বিজ্ঞাপনের নতুন খসড়াটা এনেছ ?

শঙ্খ ॥ এনেছি সার।

ফাইল খুলিয়া বিজ্ঞাপনের খসড়া খুঁজিতে লাগিল। দশরথ আসিয়া চা পরিবেশন করিল।

সিংহ ॥ দশরথ, এখন এখানে আর কেউ আসবে না—বাহিরে জানিয়ে দাও।

দশরথ বাহিরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে শঙ্খ সরকার নূতন বিজ্ঞাপনের খসড়াটি বাহির করিয়াছে

শঙ্খ ॥ এই যে সার, আপনার সেই নতুন বিজ্ঞাপনের খসড়া।

সিংহ ॥ পড়ো—

শঙ্খ ॥ (পাঠ)

"জগজ্জয়ী হিটলার সম্পর্কে নতুন তথ্য"

সিংহ ॥ বাঃ! একেবারে হিটলার দিয়ে হেডিং—বেশ হয়েছে—তারপর ?

শঙ্খ ॥ (পাঠ)

"হিটলারের জীবদ্দশায় কাণাঘুসায় জানা গিয়েছিল—এখন পরিষ্কার-রূপে জানা যাচ্ছে যে, জগজ্জয়ী হিটলার, শুধু জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন না, ভারতীয় তন্ত্রোক্ত মহাশক্তির উপাসকও ছিলেন। কাম-দেব স্বামী নামক একজন ভারতীয় শিক্ষিত তান্ত্রিক মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় খাস বার্লিনে; এবং এটাও অধুনা প্রমাণিত হ'য়েছে যে, ঐ তান্ত্রিক সাধুর নিকট দীক্ষা নিয়ে তিনি তন্ত্রোক্ত মহা-

শক্তি কামরূপা কামাখ্যার সাধনা করেই জগজ্জয়ী শক্তির অধিকারী হন। তন্ত্রোক্ত সাধনে উত্তরসাধিকা আবশ্যক হয়।—এই অভাব পূরণের জন্যেই চিরকুমার হিটলার ষোড়শী কুমারী ইভা ব্রাউনের পাণি গ্রহণ করেন—কিন্তু নিয়তির ক্রূর পরিহাসে ইভা ব্রাউন তন্ত্রোক্ত সাধনাকে উপেক্ষা করেন, আর তার ফলেই, হিটলারের হয় অনিবার্য পতন।

সিংহ ॥ বাঃ! তারপর?

শঙ্খ ॥ (পাঠ)—'হিটলারের তন্ত্রগুরু কামদেব স্বামী কর্তৃক প্রবর্তিত কামধেনু কবচ বহু কষ্টে বহু অর্থব্যয়ে তন্ত্রোক্ত মতে নির্মিত হয়েছে—অষ্ট বৎসর ব্যাপী কাম-যজ্ঞ-ভস্মে, মহাশক্তি কামরূপা আশ্রমে। এইকবচ সুখ-সাধ্য—নিয়মমত ধারণ করলে যে-কোনো অভীষ্ট সিদ্ধি অবশ্য-ম্ভাবী। উষা স্নান করে কেওড়াতলা মহাশ্মশান সন্নিকটে অবস্থিত মহাশক্তি আশ্রমে সকাল সাতটা থেকে বারটার মধ্যে এসে শ্রীশ্রীকাম-দেব স্বামীর প্রধান শিষ্য শ্রীকামরূপানন্দের শরণাপন্ন হলে নামমাত্র দক্ষিণায় কবচ প্রাপ্তি হবে—সঙ্গে সঙ্গে হবে কামসিদ্ধি ও অর্থ পূরণ। মধ্যাহ্নে প্রসাদের সুব্যবস্থাও আছে।'

সিংহ ॥ শেষের দিকটা কিন্তু নতুন নয়—এ আগেও ছিল। তবে হুঁ, বিজ্ঞা-পনে হিটলারের উল্লেখটা বেশ জোরালো হয়েছে তা বেশ, বিজ্ঞাপনটা আজই সব কাগজে ছেড়ে দাও শঙ্খ।

শঙ্খ ॥ দেব সার।

সিংহ ॥ মধ্যাহ্নে ঐ প্রসাদের কথাটাতে আর একটু জুড়ে দাও—আমিষ ও নিরামিষ প্রসাদ—তার মানে অবাঙ্গালী খদ্দের আমি আরও কিছু টান্‌তে চাই।

শঙ্খ ॥ জুড়ে দিচ্ছি সার। কিন্তু এতে ওখানকার প্রসাদের বাজেট-টা বেশ মোটা অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াবে।

সিংহ ॥ তা' দাঁড়াক্। জলেই জল দাঁড়ায়। ইংরাজীতেও বলে—As you

sow, so you must reap—সেজন্য ভেব না শঙ্খ। এখন দেখছি, এই কামধেনু কবচের ব্যবসাটাই আমার বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শঙ্খ॥ বলেন কি সার? বস্তিঘর ভাড়া দেওয়ার চেয়ে কবচের ব্যবসা বড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

সিংহ॥ দাঁড়াবে না! বস্তিতে যে এখন রাজনীতি ঢুকে গেছে—আর তা' ছাড়া লোকের মনে এখন কেবলই frustration—জীবনযুদ্ধে মানুষ যখন ক্ষতবিক্ষত হয়—আর দাঁড়াতে পাচ্ছে না মনে হয়—মনোবল যখন ভেঙে পড়ে—তখন—তখনই—মানুষ ঝুঁকে পড়ে জ্যোতিষীর দুয়ারে—নতুবা তাবিচ-কবচের সন্ধানে—বুঝলে হে শঙ্খ। সরকারের যা মতিগতি দেখছি, কোনো ব্যবসাতে আর সুখ-সুবিধে নেই। আর দশটা ব্যবসার সঙ্গে আমার এই তাবিচ-কবচের ব্যবসাটা ছিল ব'লেই আজ আমি দাঁড়িয়ে আছি শঙ্খ।

শঙ্খ॥ কিন্তু সার, আমি তো আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না—১০০৲ টাকা বেতনে আজ তিন বৎসর আপনার কাজ করছি—আপনি নিজ মুখেই বলেছেন ব্যবসাটা ফেঁপে উঠেছে, অবশ্য সে আপনার কপালে সার—কিন্তু আমার মাথাটাও এজন্যে একটু দায়ী—দায়ী নয় কি সার? ঐ যে সব বিজ্ঞাপন—এই বিজ্ঞাপনই হ'ল আপনার আসল মূলধন, সেই আমার মাথার ঘিলু আর হাতের এই কলমই যোগাচ্ছে, নয় কি সার?

সিংহ॥ ও! তুমি বলতে চাও, তোমার ঐ উর্বর মস্তিষ্ক আর ঐ আট আনা দামের ঝরণা কলমই আমার এই মূলধন জুগিয়েছে—বেশ, জুগিয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখা যাক্।

শঙ্খ॥ হ্যাঁ সার—আপনি সেটা দেখবেন, এই আশাই আমি করব।

সিংহ॥ নিশ্চয়ই দেখব। এখুনি দেখছি। বিজ্ঞাপনের এই কপি—তোমার শেষ কপি—এ-মাসের আর ক'টা দিন বাকী আছে—এই কটা-দিন কাজ করে নতুন মাসের পয়লা তারিখে তোমার বেতন নিয়ে

এখানকার কাজ খতম করে চলে যেও—ছ'মাস বাদে আর একবার দেখা করতে এস—তখন বোঝা যাবে মূলধন কে জোগায়!

শঙ্খ ॥ দয়া করুন সার—দয়া করুন—আমার কথা ধরবেন না—আপনি দয়া করুন।

সিংহ ॥ দয়া আমি করি না এ-কথা ভাবলে তোমার পাপ হবে শঙ্খ—মহাশক্তি কামরূপা আশ্রমে দিনে পাঁচশ' দুস্থ লোকের প্রসাদ বিতরণ, তোমার এই প্রতাপ সিংহই দয়া করে করেন—কিন্তু দয়া করতেও পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে দেখতে হয়।

শঙ্খ ॥ বটে! আপনি মহাশক্তি আশ্রমে, দয়া করে প্রসাদ বিতরণ করছেন, তা সত্য, আর তা কচ্ছেন আপনারই স্বার্থের জন্যে, সেটা আরো বড় সত্য। এ-যদি না বলি, আমার সত্যি সত্যি পাপ হবে সার। আপনার এই যে গোপন তাবিচ কবচের ব্যবসা—আর তারি স্বার্থে গোপনে এই যে দানধ্যান—তা আপনার দেশবাসী, আপনার বন্ধুবান্ধব—আত্মীয়স্বজন না জানতে পারেন; আমি তা জানি সার। না, না, আপনি চটবেন না সার—কামধেনু নই সত্যি—কিন্তু আমিও আপনার একটি গরু, আপনাকে দুধ দিচ্ছি—আমার চার-চারটে বাছুরের জন্যে আর একটু দুধ রাখুন—নইলে আমার বাছুরগুলো শুকিয়ে মরছে সার!

সিংহ ॥ আমার যা বলবার, বলেছি। পয়লা তারিখে এসে তোমার শেষ বেতন নিয়ে যেও, শঙ্খ, এই আমার শেষ কথা। তিন বছর তুমি আমার কাছে কাজ করে তুমি আমাকে চেননি—দয়ার পাত্র বুঝলেই দয়া করি—স্বার্থের জন্য নয়।

প্রতাপসিংহ উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন

শঙ্খ ॥ বটে! আচ্ছা। বেশ।

কাগজপত্রগুলি গুছাইয়া ফাইলটা লইয়া চলিয়া গেল

—কালক্ষেপসূচক পটক্ষেপ—

পরবর্তী মাসের পয়লা তারিখের প্রাতে—দশরথ পূর্ববৎ প্রাত্যহিক কর্ম হিসাবে পুরাতন ফুল সরাইয়া নূতন ফুলে ফুলদানি সাজাইতেছে। কয়েকখানি খবরের কাগজ ও ফাইল হস্তে শঙ্খ সরকারের প্রবেশ

দশরথ ॥ এই যে শাঁখবাবু, নমস্কার !

শঙ্খ ॥ আবার শাঁখ ! তোমায় কতবার বলেছি দশরথ আমি শাখ নয়—শাঁকালু নয়—আমি শঙ্খ সরকার।

দশরথ ॥ তা' আপনি বাবু যা-ই হও, বাজাও তো শাখ।

শঙ্খ ॥ বাজাতাম—তোমাদের কর্তার শাঁখ আমিই বাজাতাম—কাল পর্যন্তও বাজিয়েছি—কিন্তু আজ মাসের পয়লা—শাঁখ বাজানো আমার ফুরিয়েছে—আজ আমি শিঙ্গা ফুকতে এসেছি—শিঙ্গা। কই, কর্তা কোথায় ? দিল্লী থেকে ফেরেননি ?

দশরথ ॥ তা ফিরেছেন।

শঙ্খ ॥ বাঁচা গেল। ঘুম ভেঙেছে ?

দশরথ ॥ তা' ভেঙেছে—কিন্তু বাড়ি নেই।

শঙ্খ ॥ বলো কি দশরথ—এতো সকালে বাড়ি নেই ?

দশরথ ॥ হ্যাঁ, নেই। খালি কি কর্তা নেই ! কর্ত্রী নেই—মিশিবাবা নেই।

শঙ্খ ॥ বলো কি ? সব উধাও—এই ভোরে !

দশরথ ॥ সব উধাও—এই ভোর বেলা।

শঙ্খ ॥ ব্যাপার কি ! ব্যাপার কি দশরথ ? একসঙ্গে সব হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন !

দশরথ ॥ হাওয়া খেতে গেলেন কি—রসগোল্লা খেতে গেলেন সে বাপু আমি জানি না—আমি দেখনু কেউ চা-ও খেলেন না—এক একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সব ছুটলেন—কোথায় ছুটলেন—মা গঙ্গা জানেন।

শঙ্খ ॥ হুঁ, মা গঙ্গা জানুন আর না জানুন—আমি জানি।

দশরথ ॥ জানেন—আপনি বাবু জানেন?

শঙ্খ ॥ যারা খবরের কাগজ পড়েছে—তারাই জানে। তুমি পড়োনি—তাই জানো না।

দশরথ ॥ খবরের কাগজই যদি পড়ব তবে এ-দশরথ রাজা দশরথ হ'ত—খানসামা হ'ত না।

শঙ্খ ॥ সেটা ভাল। তুমি রাজা হ'লে তোমার হাতের এক পেয়ালা চা মিলত না বাবা।

দশরথ ॥ মিলবে—মিলবে। তুমি বাবু বলো খবরের কাগজে কি বেরুল—যে বাবুরা সব পড়ল, আর পথে ছুটল!

শঙ্খ ॥ তা বললে, তুমিও এখুনি পথে ছুটবে—আমার কপালে চা-টা আর জুটবে না। চা-টা আনো—খবরের কাগজ পড়ছি, শোনো।

দশরথ ॥ আরে, চা তো আমার তৈরী। এখুনি দিচ্ছি।

দশরথ চা আনিতে গেল, শঙ্খ সরকার খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া তাহাতে মনোসংযোগ করিল। দশরথ চা লইয়া আসিল

দশরথ ॥ এই নাও বাবু চা। খাও আর বলো—কাগজে কি বেরুল?

শঙ্খ ॥ (চায়ে চুমুক দিয়া বিজ্ঞাপন পাঠ) **"এক লক্ষ টাকা পুরস্কার"** কোলিয়ারী মালিক কোটিপতি এক বাঙালী—হঠাৎ মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া রাতারাতি পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করিয়া দরিদ্রবেশে সকলের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। মধ্যবয়সী। কিন্তু চেহারা দেখিলে বয়স অনুমান করা কঠিন। ঘনকৃষ্ণ চুল, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ ন্যাড়া হইবার মতলব হইয়াছিল। পারিবারিক কারণে ফটো এবং নামধাম প্রকাশ করা গেল না। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সংগোপনে লোকটিকে সশরীরে ধরিয়া দিতে পারেন—তবে এক

লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবেন। বক্স নং ৪৭৪৩—দেশবার্তা পত্রিকা —এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।”

দশরথ ॥ ওরে বাবা! এই ব্যাপার।

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ।

দশরথ ॥ কোটিপতি?

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ।

দশরথ ॥ বাঙালী?

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ, বাঙালী।

দশরথ ॥ তা এত বড়লোক, ঘর থেকে পালাল কেন বাবু?—দুঃখটা কি?

শঙ্খ ॥ হেড্ অফিসে গোলমাল হ’লো।

দশরথ ॥ কেন হ’লো বাবু—অতটাকা!

শঙ্খ ॥ হয়—হয়—যারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়—যারা আঠার আনা দাম নিয়ে খাবার জিনিসে ভেজাল মিশিয়ে তিলেতিলে লোক মেরে লাখ লাখ টাকা রোজগার করে—ভগবানের হাতে তারা একদিন এমনি মার-ই খায় দশরথ।

দশরথ ॥ না বাবু। তা’ না। বড়লোকদের বাড়ি—জানি তো—ঘা-টা মেরেছে লোকটার পরিবার—মানে, কর্তা যখন টাকা হাতাচ্ছেন—পরিবার তখন বেহাত হ’য়ে গেছেন। এ-ঘা খেলে পাগলই হ’তে হবে। ওরা তো বড়লোক, ছোটলোক আমি—টাকা রোজগার করতে বিদেশে পড়ে আছি—রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে যা-তা ভাবি—আমার মাথাটাও কেমন গোলমাল হ’য়ে যায়।

শঙ্খ ॥ দেখো, তুমি আবার নিরুদ্দেশ হ’য়ো না দশরথ।—হ’লে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিয়েও কেউ বিজ্ঞাপন দেবে না।—এ কি, কোথায় চ’ললে?

দশরথ ॥ কর্তারা গেছেন—আমিই বা ঘরে বসে থাকি কেন। কপালটা আমিও ঠুকে দেখি। বলা তো যায় না—যদি ফাঁক তালে

বাজিটা মেরে দিতে পারি—পুরী এক্স্প্রেসে সটান চলে যাব শ্বশুরবাড়ি। সুভদ্রাকে চোখে চোখে রেখে—যে-কদিন বাঁচব—পায়ের ওপর পা রেখে খেয়ে পরে বাঁচব।

দশরথ পথে বাহির হইয়া গেল। শঙ্খ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।
সৈরভীঝি খাবারের প্লেট লইয়া আসিল

সৈরভী॥ (শঙ্খকে দেখিয়া) ও···মা। কামধেনু বাবু যে! তা' সে মিন্‌ষে গেল কোথায়—দশরথ? বলনু খাবারটা নিয়ে যা—তা মিন্‌ষের তর্ সইল না—চা নিয়ে এমন ছুটে এল—যেন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। (খাবারের প্লেট সামনে রাখিয়া) নাও বাপু, সকাল বেলা একটু মিষ্টি মুখ করো। তা সে-মিন্‌ষে গেল কোথায়?

শঙ্খ॥ টিকিট কাট্‌তে।

সৈরভী॥ টিকিট! কিসের টিকিট গো।

শঙ্খ॥ ঐ যে বল্‌লে—শ্বশুরবাড়ির। যাক্, হালুয়াটা তুমি করেছ বুঝি সৈরভী? খেতে কি মিষ্টি!

সৈরভী॥ তা বাপু, তুমি তব্ বল্‌লে—আর যারা খাবে, মনে মনে বলবে, 'আঃ, কি খেলাম', মুখে বলবে 'ছাই'। এনে দেব—আর একটু বাবু?

শঙ্খ॥ না সৈরভী। থাক্। তোমার টান পড়বে। তোমার মানুষটির খবর কি—সেই যে অসুখ হয়েছিল! সেরেছে?

সৈরভী॥ মা মঙ্গল চণ্ডী—প্রাণেই রক্ষা করেছেন—কিন্তু চাকরিটা তো গেছে—এখন নিজেই বা কি খায়—আমাদের মুখেই বা কি দেয়! মিছে বলবুনি বাবু, এ বাড়ির বাজারটা হাতে আছে, তাই এখনও দু-বেলা আধপেটা চল্‌ছে—তা বাবু এতো করে তোমার কাছে চাইনু

—ঐ একটা কামধেনু কবচ—দিলে না তো! মিন্‌ষেকে যদি একবার ধারণ করিয়ে দিতে পারতাম—কপালটা হয়তো ফিরত। পাঁচ টাকা দাম—এজন্মে আর হবেনি বাবু!

শঙ্খ॥ তোমাদের কর্তার যে কড়া হিসেব—ছুঁচ গলবে না। কি করে দেব! তবে হ্যাঁ, আজ তোমার হাতে যে হালুয়া খেলাম—আর তোমার মুখে যে-দুঃখের কথা শুনলাম—তাতে ও-কবচ কেন—ও-কবচের বীজমন্ত্রটাই আমি তোমাকে দিচ্ছি—দু-ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের বরাত ফিরে যাবে সৈরভী।

সৈরভী॥ কি যে বলো বাবু? এমন দিন কি হবে?

শঙ্খ॥ হবে—নিশ্চয়ই হবে। আমি তার জামিন থাক্‌ছি সৈরভী।—ছোট্ট একটু বীজমন্তর। দেবো?

সৈরভী॥ দাও বাবু। তোমার পাযে পডি বাবু।

শঙ্খ॥ না, না, পাযে পডতে হবে না। কান দিযে ভাল করে কথাটা শুন্‌তে হবে। আর যেমন বলি করতে হবে।

সৈরভী॥ বলো বাবু বলো—কি মন্তব বলো।

শঙ্খ॥ শুধু দুটি কথা—'কাল রাজা—আজ ফকির'—বলবে তোমার স্বামী—বিডবিড করে বারবার বলবে—বল্‌তে বল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে সোজা এই বাডির ফটকে—বিড্‌বিড করে কেবল যেন বলে—'কাল রাজা আজ ফকির'—কিন্তু খবরদার এই মন্তর ছাডা আর একটি বাজে কথা নয়—যদি কিছু বলতেই হয—তবে ইসারা।—খেতে বললে খাবে—বসতে বললে বসবে—ব্যাস! ঐ মন্তরটির জোরে—ফকির কেমন করে রাজা হয তুমি স্বচক্ষে দেখবে সৈরভী, আজই, কিন্তু খবরদার—কেউ না জানে, ও তোমার কে। জেনেছে কি গেছো!

সৈরভী॥ না, না তা কেন? অতো বোকা সৈরভি ঝি নয়। এসব আবার বলবার কথা না কি? পাশেই তো আমার বস্তি—যাচ্ছি

বাবু, পাঠাচ্ছি—এখনই পাঠাচ্ছি! দোহাই মা মঙ্গলচণ্ডী! মিনুষেকে রাজা করো বাবা!

সৈরভী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তখনই গৃহকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল

জগদ্ধাত্রী ॥ এই সৈরভী! কোথায় ছুটেছিস্? আ মর। গায়ে ধাক্কা দিযেই চলে গেল! হলো কি! না, না, আপনি আসুন—আসুন—আসুন।

বাহিরের দরজা দিয়া জগদ্ধাত্রী দেবীর প্রবেশ। দেখা গেল তিনি একটি মধ্যবয়সী লোককে একপ্রকার টানাটানি করিয়াই ভিতরে আনিলেন। লোকটির ছিন্নভিন্ন বেশ। মাথা ন্যাড়া। বোকা বোকা চাহনি। কপালে ফেঁাটা তিলক। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। হাতে একতারা

জগদ্ধাত্রী ॥ কি দেখছেন? এ-বাড়ি—এই সিংহকুটীর আমারই। বসুন—আপনি দয়া করে বসুন।

লোকটি মাটিতে বসিতে গেল

জগদ্ধাত্রী ॥ না—না। ও কি! মাটিতে কেন? আপনি এই সোফায বসুন।

লোকটি ॥ না—না। পাযে এতো ধূলো—

জগদ্ধাত্রী ॥ না—না। ধুলো তাতে কি—ধুলোরি তো শরীর—ধুয়ে দিলেই হবে। দশরথ! দশরথ।

শঙ্খ ॥ দশবথ বাড়ি নেই। পা ধোবার জল তো? সে আমিই দিচ্ছি।

জগদ্ধাত্রী ॥ না—না, শঙ্খ! তুমি ওঁকে বাথরুমে নিয়ে যাও—আমি একটু চা জলখাবার দেখি।

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ, বাড়িতে তো আর কেউ নেই—আপনাকেই দেখতে হবে বৈ-কি।

জগদ্ধাত্রী ॥ দেখছি বাবা দেখছি—তবু রক্ষে তুমি আছ—হাতে যখন কাগজ, জানো তো সব—দেখো বাবা যেন শেষ রক্ষে হয়।

শঙ্খ ॥ হবে। হবে। আমার মনে হচ্ছে আপনি ঠিকই ধরেছেন কর্তামা।

জগদ্ধাত্রী ॥ এই তো বাবা তুমি বুদ্ধিমান ছেলে; বুঝেছো। বড়কষ্টে আমি মহাপুরুষকে ধরে এনেছি। আসুন বাবা হাত-পা ধুয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে একটু বিশ্রাম-সুখ হ'ক্। যাও বাবা শঙ্খ, মহাপুরুষকে বাথরুমে নিয়ে যাও। দেখো বাবা, মহাপুরুষের কেমন পালাই-পালাই ভাব—ছেড না বাবা।—হবে—হবে, তোমারও কিছু হবে। আমি যাই খাবারটা নিয়ে আসি।

জগদ্ধাত্রীর অন্দরে প্রস্থান

শঙ্খ ॥ আসুন মহাপুরুষ—আসুন।

মহাপুরুষ ॥ না, না, ও ভিক্ষে-টিক্ষে আমি আর চাই না—আমাকে বাবু তোমরা ছেড়ে দাও—আমার দম্ আট্‌কে আস্‌ছে—ভিক্ষে করতে বেরিয়ে, এ কোথায় এলুম-রে বাবা। পাগলা গারদ নাকি।

শঙ্খ ॥ পাগলা গারদ।

মহাপুরুষ ॥ তা নয় তো কি।

শঙ্খ ॥ পাগলা গারদ। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

শঙ্খ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই অসতর্ক মুহূর্তে মহাপুরুষ শঙ্খের হাত ছাড়াইয়া পালাইতে গেল। শঙ্খ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল

শঙ্খ ॥ সে কি মহাপুরুষ। আপনি মহাপুরুষ হ'য়ে চোরের মতন পালাচ্ছেন—জেলে যাবেন যে।

মহাপুরুষ ॥ জেলে।

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ—জেলে। জানেন তো এরা লক্ষপতি লোক। চুরির চার্জে ফেলে দিলে, আর রক্ষে নেই। তিনটি বছর ঘানি টান্‌তে হবে যে মহাপুরুষ।

মহাপুরুষ ॥ তাই তো বাবা—তুমিই বলো বাবা—কি করে এখন আমি বাঁচি! 'জয় রাধে' বলে মা লক্ষ্মীর কাছে পথে ভিক্ষে চেয়েছি—এই দোষ, এ-কি সাজা বাবা! আমায় ছেড়ে দাও বাবা—তোমার পায়ে পড়ি!

শঙ্খ ॥ ছিঃ—ছিঃ মহাপুরুষ, এ আপনি কি করছেন? আচ্ছা, আপনি ভাববেন না, আপনাকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে—আমি আপনাকে বাঁচবার মন্ত্র দিচ্ছি—মালক্ষ্মী খাবার নিয়ে যেই ঘরে ঢুকবেন, আপনি শুধু একটিবার চেঁচিয়ে ওঁকে বল্‌বেন—'কাল রাজা—আজ ফকির'—বস্‌ আর কথাটি নয়। বাঁচবার শুধু ঐ একটি মন্ত্র—কাল রাজা আজ ফকির—খবরদার এ ছাড়া আর কোনো কথা ক'য়েছেন, কি গেছেন!

মহাপুরুষ ॥ তা হ'লে ছাড়া পাব?

শঙ্খ ॥ পাবেন—পাবেন। দেখবেন আদর যত্নটা ওতে আরও বেড়ে যাবে—তখন আপনি আব্দার ধরবেন, আমি হাওয়া খাব—লেকে যাব—তখনই মোটর ছুটবে আপনাকে নিয়ে, লেকে। লেকে যাবেন—হাওয়া খাবেন—হাওয়া হবেন। চুপ! ঐ যে মালক্ষ্মী আস্‌ছেন—আপনি বসুন।

শঙ্খ চট্‌ করিয়া নিজের ধুতির কোঁচার দ্বারা মহাপুরুষের পদধূলি পুছিয়া দিল। সোফার উপরে মহাপুরুষ দুই পা তুলিয়া উবু হইয়া বসিলেন। জগদ্ধাত্রী দেবী বিশাল এক থালায় বহুবিধ মিষ্টি ষোড়শোপচারে সাজাইয়া আনিয়া দাঁড়াইলেন। শঙ্খ ছুটিয়া গিয়া মহাপুরুষের সম্মুখে একটি বড় টিপয় আনিয়া রাখিল। জগদ্ধাত্রী দেবী খাবারের থালা তাহার উপর রাখিলেন। জগদ্ধাত্রী যুক্ত করে মহাপুরুষের সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী ॥ কোটিপতির উপযুক্ত নয়—তবু গরীবের এই খুঁদকুড়ো—

মহাপুরুষ ॥ (চিৎকার করিয়া) 'কাল রাজা—আজ ফকির'।

জগদ্ধাত্রী ॥ এই তো ধরা দিলে বাবা! তবে কেন এতক্ষণ ছলনা করছিলে মহাপুরুষ! আর তো তোমায় ছাড়ছি না বাবা লক্ষেশ্বর!

ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে। এই মহাপুরুষ ভিখারী বৈষ্ণবের বোষ্টমী গুটিগুটি এখানে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বোষ্টমীটি যৌবনবতী এবং হৃষ্টপুষ্টা।

বোষ্টমী ॥ তবে রে মিন্‌সে, তোর পেটে এতো—রাধার কুঞ্জে মন উঠল না! (জগদ্ধাত্রী দেবীর দিকে তাকাইয়া) শেষে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ডুব দিয়ে জল খাচ্ছিস! হাতে নাতে ধ'রে ফেলেছি। (চারিদিকে খুঁজিয়া) কেমন বাড়ি!—একটা ঝাঁটা নেই!

মহাপুরুষ এই হুঙ্কারে এক লম্ফে কক্ষ হইতে ছুটিয়া পালাইলেন

জগদ্ধাত্রী ॥ কি সর্বনাশ! ধরো বাবা—ধরো!

বৈষ্ণবী তখনি রণচণ্ডী মূর্তিতে কোমরে আঁচল বাঁধিল

বোষ্টমী ॥ তুমি তো মাগী খুব! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—আমার মানুষ নিয়ে টানাটানি—ধন্যি বাবা বড়লোক—তোমাদের খুরে নমস্কার!

জগদ্ধাত্রী ॥ না, না—শোনো!

বোষ্টমী ॥ কি আবার শুনব। নাই বা থাকল ঝাঁটা—দাঁত নেই? আমি কামড়াব—কামড়াব। এই আমি চলনু—কে আমার কামড় খাবে—এসো!

বৈষ্ণবীর প্রস্থান। শঙ্খ তাহার উদ্দেশ্যে বলিল—

শঙ্খ ॥ কেউ খাবে না মা—কেউ খাবে না—তুমি এসো মা—এসো!

জগদ্ধাত্রী ॥ হায়! হায়! তীরে এসে তরী ডুবল বাবা!

শঙ্খ ॥ আপনি ভুল করছেন মা—উনি নন্—বিজ্ঞাপনে তো এ কথা নেই—গৃহিণী নিয়ে কোটীপতি গৃহ ছেড়েছেন!

জগদ্ধাত্রী ॥ ও! তাও তো বটে! নাঃ—আমার বরাতই খারাপ। কিন্তু লাখ টাকা আমি ছাড়বো না—ঠাকুর ঘরে গিয়ে—একটু কান্নাকাটি করে এখুনি আবার আমি বেরুব। আমার মন বলছে—আমি পাব—আমি পাব—আমি পাব!

জগদ্ধাত্রী অন্দরে চলিয়া গেলেন

শঙ্খ ॥ জয় রাধে !—তোমার ইচ্ছায় কি না হয়—রাজা ফকির হয়—আবার ফকিরও রাজা হয়। তা না হলে আজ সকালে আমার কপালে এতো সব রাজভোগই বা কেন ?

শঙ্খ মিষ্টিগুলি চটপট্ খাইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার কি মনে পড়িল

শঙ্খ ॥ এই যা ! ভোলানাথের কথাটা একেবারে ভুলে গেছি !

গ্লাসের জলে চট করিয়া হাত ধুইয়া ছুটিয়া গেল টেলিফোনের কাছে—একটি নাম্বার ডায়াল করিয়া—টেলিফোনে আলাপ করিতে লাগিল

শঙ্খ ॥ হ্যালো ! বহুরূপা নাট্যসঙ্ঘ ? দয়া করে আপনাদের ডিরেক্টর ভোলানাথ চৌধুরীকে একটু দিন না ! (একটু পর)……কে ভোলানাথ ? …হ্যাঁ আমি শঙ্খদা। হ্যাঁ…বিজ্ঞাপন পড়ে এ-বাড়িতেও মজা বেঁধে গেছে। হ্যাঁ, কর্তা-গিন্নী মায় মিশিবাবা সবাই পথে বেরিয়ে পড়েছে। ……কি ? সব বাড়িতেই এই রঙ্গ চল্‌ছে ?…বেশ…বেশ…বেশ… সেই যা কথা হয়েছে…তুই ভাই এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়া। Hurry up ! Hurry up ! Best of Luck !

শঙ্খ ফোনটি রাখিয়া দিল ! সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে দরজার বাহিরে গোলমাল শোনা গেল

সিংহ ॥ আসুন মশাই ! ভেতরে আসুন ! ভয় কি ? চা খেতে খেতে একটু গল্প-সল্প করা এই যা !

শ্রীসিংহ সৈরভীর স্বামী ষষ্ঠীচরণকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে শঙ্খ দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীসিংহ একটু বিরক্ত হইলেন

সিংহ ॥ আঃ ! এখন আবার তুমি কেন ?

শঙ্খ ॥ আজ পয়লা তারিখ সার। আপনি আস্‌তে বলেছিলেন।

সিংহ ॥ না—না—সে এখন নয়—তুমি এখন এসো। (চীৎকার করিয়া) দশরথ !

শঙ্খ ॥ নেই সার। বাড়িতে নেই।

সিংহ ॥ বাড়ি নেই মানে ?

শঙ্খ ॥ কর্তী মা আর আমি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই স্যার।

সিংহ ॥ সবাই বুঝি আজ কাগজ পড়েছে ?

শঙ্খ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

সিংহ ॥ কি বিপদ! একটু চা-টা—আচ্ছা, তুমি তোমার কর্তীমাকে একটু ডেকে আন দেখি শঙ্খ।

শঙ্খ ॥ আজ্ঞে তিনি ঠাকুর ঘরে দরজায় খিল এঁটে একটু কান্নাকাটি মানে একটু প্রার্থনা করতে গেছেন!

সিংহ ॥ কি বিপদ! তা—একে ছেড়ে আমিও যেতে পাচ্ছি না। দেখ দেখি—একটু চা-টা—

শঙ্খ ॥ টা—এখানেই রয়েছে—(খাবারের থালা দেখাইল) চা আমি আনছি—

এমন সময় বাহির হইতে সৈরভী প্রবেশ করিল

শঙ্খ ॥ (কৃত্রিম রোষে) কোথায় থাকো সৈরভী! (চাপা গলায়) দেখছ না কে এসেছেন! শীগগির চা।

সৈরভী ত্বরিত পদে চা আনিতে ভিতরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে শ্রীসিংহ ষষ্ঠীচরণকে অনেক বলিয়া কহিয়া সোফাতে বসাইয়াছেন। ষষ্ঠীচরণ কিন্তু কোন কথারই জবাব দিতেছে না—শুধু বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিতেছে।

সিংহ ॥ (ষষ্ঠীচরণকে) কি বলছেন? দয়া ক'রে একটু জোরে বলুন।

ষষ্ঠীচরণ ॥ কি আর বলব—'কাল রাজা—আজ ফকির।'

ষষ্ঠীচরণ আবার বিড়বিড় করিতে লাগিল

শঙ্খ ॥ (সিংহকে চাপা গলায়) মেরে দিয়েছেন স্যার।

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) দেখো বাবা—না পালায়—তুমি ঐ দরজাটা আগলে বোসো।

শঙ্খ ॥ আমি থাকৃতে পালাবে! আপনি ভাববেন না সার—(মাল কোঁচা মারিল)

সিংহ ॥ (ষষ্ঠীচরণকে) কাল রাজা আজ ফকির—বটেই তো—বটেই তো। দুনিয়াটাই এই! নয়তো কি? এই তো আপনি—ক্রোড়পতি ছিলেন তো—ছিলেন কি না?

ষষ্ঠীচরণ ঘাড় নাড়িয়া কখনও 'হ্যাঁ' কখনও 'না' বলিতে লাগিল

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) কি বলছেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

শঙ্খ ॥ কেন! ঐ তো ইসারায় বললেন—ক্রোড়পতি ছিলেন। আবার এও বললেন—আর নেই। (ষষ্ঠীচরণকে) তাই না সার?

ষষ্ঠীচরণ ॥ 'কালরাজা—আজ ফকির'!

ষষ্ঠীচরণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। চা লইয়া সৈরভী প্রবেশ করিল। শঙ্খ ছুটিয়া আসিয়া সৈরভীর হাত হইতে চা লইয়া—

শঙ্খ ॥ এই চা—(খাবারের থালা টানিয়া ষষ্ঠীর সামনে রাখিয়া)—এই টা—

সিংহ ॥ (ষষ্ঠীকে) জানি ক্রোড়পতির যোগ্য নয়—তবু একটু মিষ্টি মুখ তো করতেই হবে সার।

ষষ্ঠীর দৃষ্টি কিন্তু সৈরভীর প্রতি নিবদ্ধ। এইবার দুই পা নাচাইতে নাচাইতে সৈরভার পায়ের দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিতে লাগিল

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) ব্যাপার কি?

শঙ্খ ॥ (চাপা গলায়) বোধ হয় সৈরভীকে পা-টিপতে ইসারা করছেন—দেখছেন না! পা দুখানির কি ব্যাকুলতা!

সিংহ ॥ তা হবে, ক্রোড়পতি লোক পথ হেঁটে হেঁটে—(হঠাৎ সৈরভীর প্রতি) সৈরভী! আর দেখছিস কি—তোর বরাত ফিরে গেল—শীগগির পা টিপে দে।

সৈরভী ॥ (লজ্জা পাইয়া জিভ কাটিয়া) কি যে বলেন কর্তা।

সিংহ ॥ (রাগিয়া) যা বলছি—পা টিপে দে।

সৈরভী এই শাসনের ধাক্কায় ছুটিয়া গিয়া ষষ্ঠীচরণের পা টিপিতে লাগিল। ষষ্ঠীচরণ আনন্দিত মনে এইবার আহার করিতে লাগিল। শঙ্খ ও সিংহ সবিস্ময়ে দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন। ষষ্ঠীচরণ একটি রাজভোগ সৈরভীর মুখে ধরিল। শঙ্খ ও সিংহ লজ্জা পাইলেন

সিংহ ॥ পেছুন ফিরে থাকো শঙ্খ—ও-দিকে তাকিও না।

শঙ্খ ও সিংহ সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ষষ্ঠীচরণ ও সৈরভী তাহা সুযোগ বুঝিয়া দুইজনেই মিষ্টিগুলি পরস্পরকে খাওযাইয়া দিতে লাগিল

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) দেখ তো এখন কি হচ্ছে।

শঙ্খ ॥ (আড় চোখে দৃশ্যটি দেখিয়া) ওরে বাবা!

মিষ্টিগুলি এতক্ষণে প্রায় সাবাড় হইয়াছে। ষষ্ঠীচরণ গিলিতে আর পারে না—এই অবস্থা। সৈরভীও।

ষষ্ঠীচরণ ॥ 'কাল ফকির—আজ রাজা!'

সিংহ এবং শঙ্খ চমকিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

সিংহ ॥ কি বললেন?

ষষ্ঠীচরণ ॥ (সংশোধন করিয়া 'কাল রাজা—আজ ফকির!' আজ রাজা—কাল ফকির!' এই তো দুনিয়া।

ষষ্ঠীচরণ হাই তুলিয়া সোফায় দেহ এলাইয়া দিল

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) এর মানে?

শঙ্খ ॥ আপনাদের বড়লোকদের ব্যাপার তো—একটু কিছু পেটে পড়লেই ঘুম পায়।

সিংহ ॥ তা পায়। ভালো, ভালো, ঘুমিয়ে পড়লে ভালো। বেশ খানিকটা

সময় পাব আমরা। দোর-টোর বন্ধ ক'রে চলো আমরা ওপরে যাই। পা টিপতে সৈরভী থাক্—কি বলো ?

সৈরভী ॥ দোর-টোর বন্ধ করবে কি গো !—সে আমি পারব না !

সৈরভী বাসন-টাসন লইয়া যাইবার জন্য আগেই ট্রেতে তুলিয়াছিল—এইবার ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল

সিংহ ॥ কি বিপদ! ঘুমটা আস্‌ছে আস্‌ছে মনে হচ্ছে। পা-টা একটু টিপে দিলে—

শঙ্খ ॥ আমি টিপে দেব সার ?

সিংহ ॥ না, না, তুমি পারবে না শঙ্খ—বড়লোকের পা-টেপা—তার কায়দা কানুনই আলাদা—আমি জানি, আমি টিপছি—তুমি বরং পাশের ঘরে গিয়ে খবরের কাগজের অফিসে একটা ফোন কর—বক্স নাম্বারটা বলে, যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কোনরকমে জেনে নাও। পারবে ?

শঙ্খ ॥ এ আর পারব না সার ? কামধেনু কবচের বিজ্ঞাপন লিখে লিখে প্রায় কামধেনুই হয়ে পড়েছি সার—ঠিকানা তো ঠিকানা—বাঘের দুধ চান এনে দিচ্ছি !

শঙ্খ পাশের ঘরে যাইতেছিল, দেখিল শ্রীসিংহ স্বয়ং মেঝেতে বসিয়া ষষ্ঠীচরণের পা টিপিতে সুরু করিয়াছেন। শঙ্খ মুচকি হাসিল। কিন্তু তাহার কৌতুক আরও বাড়িয়া গেল—যখন সে দেখিল অপর দরজায় সৈরভী আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া জিভ কাটিয়া ঘোমটা টানিয়া আবার ছুটিয়া পালাইল। শঙ্খ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই হাসিতে ষষ্ঠীচরণ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু তাহার মর্দিত পা দুটি টানিয়া লইল না

সিংহ ॥ (রাগিয়া গিয়া শঙ্খকে) Idiot !

ষষ্ঠীচরণ ॥ না, না, ঠিক আছে—'কাল ফকির—আজ রাজা।'

ষষ্ঠীচরণ আবার তাহার দেহ এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিল। বলাবাহুল্য সিংহ পূর্ববৎ তাহার পা-দুটি টিপিয়া যাইতে লাগিলেন। কেবল চাপা গলায় শঙ্খকে নির্দেশ দিলেন—

সিংহ ॥ টেলিফোন !

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ, সার।

শঙ্খ পাশের ঘরে চলিয়া গেল নেপথ্যে বাহিরের দরজায় শোনা গেল সিংহ-কন্যা ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বর

ইন্দ্রাণী ॥ না, না—ভাবছেন কি ? আসুন—ভেতরে আসুন ভোলানাথবাবু—এই আমাদের বসবার ঘর।

দেখা গেল উস্কখুস্ক বাবরী চুলের একটি সুদর্শন যুবক সহ ইন্দ্রাণী উপবেশন কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবকটির গায়ে আদ্দির ময়লা পাঞ্জাবী। পরনে পাজামা। ইন্দ্রাণী প্রবেশ করিয়া ঘরের দৃশ্যটি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। শ্রীসিংহ ইসারায় অনুনয় করিলেন—যেন তাহারা এখানে কোনো গোলমাল না করে

ইন্দ্রাণী ॥ না, না, একি বাবা ! এ তুমি কার পা টিপ্‌ছ ?

সিংহ ॥ আঃ ! ইন্দ্রাণী ! চুপ !

ইন্দ্রাণী ॥ কি বিপদ। লোকটা যে আমাদের সৈরভীর স্বামী ষষ্ঠীচরণ—বস্তিতে থাকে !

কথাটি শোনামাত্র ষষ্ঠীচরণ তড়াক্ করিয়া সোফা হইতে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

সিংহ ॥ সে কি ?

ইন্দ্রাণী ॥ হ্যাঁ বাবা। বস্তি-উন্নয়ন কাজ করতে গিয়ে আমি যে ওদের লেখা-পড়া শেখাই।

ষষ্ঠীচরণ ॥ ‘কাল রাজা—আজ ফকির,’ ‘আজ রাজা—কাল ফকির,’ দোহাই বাবা আমি যাচ্ছি।

ইন্দ্রাণী ॥ তোমার মাথা খারাপ হ’য়ে গেছে বাবা ! দয়া করে (যুবকটিকে দেখাইয়া) এই ইনি এসেছেন—ভোলানাথ চৌধুরী—তা ভোলানাথই বটে ! আমি এখন এঁকে কোথায় বসাই ! (ভোলানাথকে) আপনি আসুন—আমার পড়ার ঘরে আসুন !

ভোলানাথ ॥ যা দেখি, সবি মায়ার খেলা ! এই আছে—এই নেই ! চলো মহামায়া—তোমার আর কি খেলা আছে দেখি !

ইন্দ্রাণী ॥ কি ভাগ্য ! (সিংহকে) বাবা !

সিংহ ॥ মনে হচ্ছে—তুইই পেয়েছিস্—ছাড়িস নি মা—নিয়ে যা—আমিও আসছি।

ইন্দ্রাণী ॥ আসুন—আপনি আসুন ভোলানাথ বাবু !

হাত ধরিয়া ইন্দ্রাণী ভোলানাথকে ভিতরে লইয়া গেল। এইবার সিংহ ষষ্ঠীর দিকে কট্‌-মট্‌ করিয়া তাকাইলেন। ষষ্ঠী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহার মন্ত্রটি জপ করিয়াই চলিল 'কাল রাজা—আজ ফকির'। সিংহ ক্রমশঃ অগ্রসর হইলেন—তিনি যতই কাছে আসেন—ষষ্ঠীর মন্ত্রের তোড়্‌ ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল

সিংহ ॥ (চীৎকার করিয়া) থামো !

ষষ্ঠী ভয়ে মন্ত্র উচ্চারণ বন্ধ রাখিল

সিংহ ॥ ভয় নেই, আমি তোমাকে মারতে পারতাম—মারব না—ঘাড় ধ'রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতাম—দেব না—জেলে দিতে পারতাম—দেব না। না, না—তোমার কোন দোষ নেই—তুমি আস্‌তে চাও নি—'কাল রাজা—আজ ফকির'—এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন কথাওতুমি এ-পর্যন্ত বলোনি। আমি, আমিই তোমাকে হাতে-পায়ে ধ'রে আমার বাড়ি এনেছি—জোর করে খাইয়েছি—আর তোমার পা টিপেছি—আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি ভাই—দয়া করে তুমি আমার ক্ষতি কোরো না—ইজ্জৎটা মেরো না—বলে বেড়িয়ো না—লক্ষপতি প্রতাপসিংহ তোমার পা টিপেছে।

ষষ্ঠীচরণ জিভ কাটিয়া ইসারায় বুঝাইল যে সে কখনও এ-কথা কাহাকেও বলিবে না

সিংহ ॥ বাঁচালে ষষ্ঠীচরণ—তুমি আমায় বাঁচালে—(পকেট হইতে কিছু নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে গুজিয়া দিয়া—) নাও, বিপদে পড়লে

সৈরভীকে দিয়ে খবর দিয়ো।—যা পারি দেব!—কিন্তু খবরদার তোমার ঐ হতচ্ছাড়া চেহারা যেন আমায় দেখতে না হয়—ঐ গোদা পা আমি টিপেছি—অসহ্য! অসহ্য!

ষষ্ঠীচরণ নোটগুলি লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সিংহ তাঁহার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই দেখেন শঙ্খ সরকার পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। বলাবাহুল্য, শঙ্খ এই স্বর্গীয় দৃশ্যটি পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিবার প্রলোভন এবং আনন্দ ত্যাগ করে নাই।

শঙ্খ॥ টেলিফোন কেবল engaed! ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যে করেন—নইলে লাইনটা পেলে ঐ জোচ্চোরটাকে নিযে আপনার কেলেঙ্কারিটা আর এক ধাপ এগিয়ে যেতো তো। তা' দেখলাম বটে আপনার চরিত্র—আপনি সার দেবতা। আচ্ছা সার, আপনি Election এ দাঁড়াচ্ছেন না কেন। বস্তির দরিদ্রনারায়ণকে আপনি বাড়িতে এনে সেবা করেন—এমন কি পা টিপে দেন—এমন দুচারটে story যদি আমি কাগজে ছাপিয়ে দি, আপনাকে Voteএ রুখতে পারে, এমন লোক তো আমি দেখচি না সার,—হোক্ Congress—হোক্ communist!

সিংহ॥ ষষ্ঠীচরণের মুখ আমি বন্ধ করতে পারব—কারণ ওরা ছোটলোক, নেমকহারাম নয়।—তোমার মুখ বন্ধ করতে হলে আমার চাকরিতেই তোমাকে রাখতে হবে শঙ্খ—হ্যাঁ, যে চাকরি তোমার আজ থেকে যাবার কথা ছিল—সে-টা যাবে কি না, তা আমি ভেবে দেখব—এখন আমার মাথার ঠিকনেই। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা জানো তো—তাই ঐ লাখ টাকার দাঁওটা কি ক'রে মারা যায় বলো তো। ইন্দ্রাণী একজনকে ধরে এনেছে—

আসল কি মেকী জানি না—আমি একটু বাজিয়ে দেখি, তুমি একটু বোসো।

ভোলানাথসহ ইন্দ্রাণীর প্রবেশ

ভোলানাথ ॥ এই আছে—এই নেই! খুব খেলা খেলছিস্ বেটী! না, না—ভোলানাথ হলেও আর আমি ভুলছি না। আর আমি ভুলছি না। (চিৎকার করিয়া) ছাড়ো—আমায় ছেড়ে দাও!

ইন্দ্রাণী ॥ (তাহার পথ রোধ করিয়া) শোনে, শোনো—দয়া করে আমার একটি কথা শোনো—এসো—এসো—

ইন্দ্রাণী তাহাকে টানিয়া লইয়া দূরের একটি সোফাতে গিয়া উভয়ে বসিল। শঙ্খ এবং সিংহ ব্যাপারটা বুঝিয়া দুইজনেই আর একটু দূরে সরিয়া গেলেন

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) কিন্তু একে তো মধ্যবয়সী বলা চলে।

শঙ্খ চট্ করিয়া বিজ্ঞাপনের কাগজটি বাহির করিয়া

শঙ্খ ॥ (পাঠ) "—……মধ্যবয়সী। কিন্তু চেহারা দেখিলে বয়স অনুমান করা কঠিন……।"

সিংহ ॥ তা বটে। তা বটে! কি যেন বলছিল—'এই ছিল—এই নেই!'

শঙ্খ ॥ তবেই দেখুন,বেশ খানিকটা মিলে যাচ্ছে।

সিংহ ॥ তা মনটা একটু ভিজল কি—তাকিয়ে একটু দেখব না কি কতটা এগুচ্ছে?

শঙ্খ ॥ না সার—ছিঃ! আমরা বরং ধীরে ধীরে কেটে পড়ি—ভেতরে। দশরথ তো নেই—চা-টা এসব এখন একটু দরকার বইকি, না না—ওদিকে ফিরে দেখবেন না—পিছু হেঁটে চলুন—আসুন!

দুইজনে পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে অন্দরে চলিয়া গেলেন

ইন্দ্রাণী ॥ ঐ তো ওরা চলে গেলেন। এইবার তুমি আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলো তোমার মনে কি দুঃখ—কি ব্যথা। এসো, ঐ জানালার ধারে গিয়ে বসি।

ভোলানাথ ॥ না, না।

ভোলানাথ পূর্বস্থান হইতে উঠিয়া সামনের সোফায় আসিয়া বসিল। পিছু পিছু উঠিয়া আসিল ইন্দ্রাণী

ইন্দ্রাণী ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমাদের এই ব্যাকুলতা—এর কি কোনো দামই নেই তোমার কাছে? মা আবার তোমার জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করতে লেগে গেছেন। খাবার নিয়ে এখুনি হয়তো এসে পড়বেন। প্রাণ খুলে কথা কইবার এইটুকু তো সময়। তুমি চুপ করে থেকো না। কথা কও।—কথা কও।

ভোলানাথ ॥ পথের ভিখিরী আমি—বল্‌তে জানি, শুধ একটি কথা—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা চাইছি, আমাকে ছেড়ে দাও

ইন্দ্রাণী ॥ না, এ-ভিক্ষা আমি দিতে পারব না।

ভোলানাথ ॥ কি বিপদ! আচ্ছা, ভিক্ষা চাইছি—আমাকে একটু একলা থাকৃতে দাও।

ইন্দ্রাণী ॥ না, তাও পারব না।

ভোলানাথ ॥ আচ্ছা। তবে আমায় একটু ভাবতে দাও।

ইন্দ্রাণী ॥ কি আবার ভাব্‌বে?—ভাব্‌বার কিছু নেই। আমি যা বলি তুমি শুধু তার উত্তর দাও।

ভোলানাথ ॥ ও বাবা! তুমি বলতে জানো—কিন্তু থাম্‌তে জানো না। —আমি বলি বরং তুমি একখানা গান গাও—রাণী।

ইন্দ্রাণী ॥ রাণী ! কার রাণী গো ?

ভোলানাথ ॥ সে তুমিই জানো—তুমিই বলো—কিন্তু কথায় নয়, গানে।

ইন্দ্রাণী সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিল। গানের মধ্যে সিংহ, শঙ্খ জগদ্ধাত্রী পাশের দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া ইহাদের মাঝে দেখিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাণী ভোলানাথের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই বাহুতে তাহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া গান শেষ করিল।

ভোলানাথ ॥ না, না—এমন ক'রে তুমি আর আমায় মায়ায় বেঁধো না মহামায়া। বিশ্বাস করো আমার কিছু নেই—কিছু নেই।

ইন্দ্রাণী ॥ কোটী কোটি লোকের আজ কিছু নেই—তাদের মধ্যেই তোমাকে আমি পেতে চাই ভোলানাথ। আমি জানি, তোমার সব ছিল, লাখ লাখ টাকা ছিল—হাজার লোককে শোষণ করে তোমার হাতে গিয়ে জমেছিল সেই টাকা—রাতে যখন শুয়ে শুয়ে তা ভাবতে, ঘুমোতে পারতে না তুমি—এমনি একটি রাতে—পালিয়ে এসে তুমি দাঁড়ালে পথে—কিন্তু কেন পালাবে তুমি! যাদের শোষণ করছো তুমি এতদিন, তাদের মধ্যেই বিলিয়ে দাও তাদের ধন! চলো ফিরে ঘরে। ঘরবাসী হও !

ভোলানাথ ॥ না আছে আমার ঘর—না আছে আমার ঘরণী। কি নিয়ে আমি ঘরবাসী হব ইন্দ্রাণী! যাবে তুমি আমার সঙ্গে ?

ইন্দ্রাণী ॥ কোথায় ?

ভোলানাথ ॥ তা আমি জানি না—মনে আস্‌ছে না আমার! চলো—পথে গিয়ে দাঁড়াই—পথই আমাদের ডেকে নেবে।

ইন্দ্রাণী ॥ পথে কেন ?—বলো প্রাসাদে।

ভোলানাথ ॥ না, না—প্রাসাদ মনে আস্‌ছে না—মনে আস্‌ছে—লেক।

ইন্দ্রাণী ॥ লেক !

ভোলানাথ ॥ আমি সব ভুলে যাই—না-না—লেক নয়—তবে অমনি একটা

কিছু—খুব নিরিবিলি—শুধু তুমি আর আমি—আমি আর তুমি—আশে পাশে কেউ নেই—যাবে ?

ইন্দ্রাণী ॥ কিন্তু অতো দূরে কি ক'রে যাব। কিসে যাব ?

ভোলানাথ ॥ তাও তো বটে। তোমার বাবার রথ নেই ?

ইন্দ্রাণী ॥ রথ।

ভোলানাথ ॥ রথ না থাক্—গাড়ী। বোলস্‌রয়েস না হ'ক—একটা ফোর্ড ?

ইন্দ্রাণী ॥ তা আছে,—হিন্দুস্থান।

ভোলানাথ ॥ হ'ক, চালাতে জানো তুমি ?

ইন্দ্রাণী ॥ তা' জানি। তুমি জানো না ?

ভোলানাথ ॥ না—যতদূর মনে পড়ছে, না। কারা যেন সব চালাতো—শিখ না পাঠান। না, না, মনে পড়েছে না—কি হবে ?

ইন্দ্রাণী ॥ কেন। আমি চালাব।

ভোলানাথ ॥ তবে চলো।

ইহারা উঠিতেছে দেখিয়া সিংহ ও জগদ্ধাত্রী বিপন্ন বোধ করিয়া ইহাদের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইলেন। শম্ভুও। সিংহ গলা খেকুর দিয়া তাহাদের উপস্থিত ঘোষণা করিলেন। ভোলানাথ ও ইন্দ্রাণী তাঁহাদের মুখোমুখি দাঁড়াইল

ইন্দ্রাণী ॥ ও—বাবা। মাও এসেছ, দেখছি। আমি গাড়িটা নিয়ে ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে একটু বেরুচ্ছি।

সিংহ ॥ বেশ তো ! বেশ তো। কিন্তু ড্রাইভার পশুপতিকে সঙ্গে দি।

ভোলানাথ ॥ বাঁচালেন। (ইন্দ্রাণীকে) পশুপতির ঘাড়ে ভর কর মহামায়া—আমাকে রেহাই দাও—ভোলানাথের আজ শুধু এই ভিক্ষা।

ইন্দ্রাণী ॥ বাবা—তুমি কিছু বোঝো না।

সিংহ ॥ বুঝি না বুঝি—তবে একটু দেরীতে বুঝি ! (জগদ্ধাত্রীকে) পশুপতির তো অসুখ করেছে না ?

জগদ্ধাত্রী ॥ অসুখ করুক আর না করুক সে যাবে না। আমার ইন্দ্রাণী ছোরা চালাতে জানে - বন্দুক ছুড়তে জানে—বক্সিং লড়তে পারে—ভয়টা

কি—একাই একশ'! (ভোলানাথকে) না বাবা, ইন্দ্রাণী একাই তোমাকে হাওয়া খাইয়ে আনবে।

শঙ্খ॥ হাওয়াই খেয়ো—হাওয়া হ'য়ো না বাবা ভোলানাথ!

ইন্দ্রাণী॥ আপনি চলুন ভোলানাথবাবু—

ভোলানাথ॥ আমার কিন্তু মাথার ঠিক নেই রাণী!

ইন্দ্রাণী॥ আঃ! রাণী নয় ইন্দ্রাণী।

সিংহ॥ তা বেশ তো! বেশ তো! রাণী বলেও ওকে আমরা ডাকি।

জগদ্ধাত্রী॥ ডাকি আর না ডাকি—ও ডাকতে চাইছে, ডাকুক।

ভোলানাথ॥ তবে আর কি। চল রাণী—

ভোলানাথ ইন্দ্রাণীকে দরজা পর্যন্ত লইয়া গিয়া হঠাৎ সকলের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল

ভোলানাথ॥ সকলে বসুন। আমার কিছু বলবার আছে। এসো ইন্দ্রাণী—তুমিও এসো। না, না, আপনারা না বস্‌লে চলবে না। আমাব বেশ কিছু বলবার আছে।

সকলে বসিলেন

ভোলানাথ॥ লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে এক অজ্ঞাতকুলশীলের হাতে মেয়েকে অসঙ্কোচে অবলীলাক্রমে যারা ছেড়ে দিতে পারে, আমি তাদের চরণে নমস্কার করি। অর্থের মোহ তাদেরই বেশী, যাদেব অর্থ আছে। গরীব মধ্যবিত্ত সমাজের কোনো বাপ কিংবা কোনো মা অর্থলোভে এতটা অমানুষ হ'তে পারতো না—কখনও না।

সিংহ॥ কে তুমি? আমাদের এমন করে অপমান করছ?

ভোলানাথ॥ আমি? আমি শ্রীভোলানাথ চৌধুরী—বি-এ ফেল—বেকার যুবক—কাজকর্ম নেই—বহুরূপা নাট্যসঙ্ঘের ডিরেক্‌টারি করে সময় কর্তন করি। আজ কাগজে ক্রোড়পতির নিরুদ্দেশ সংবাদ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম—লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে কলকাতার ঘরে ঘরে গরীবদের ধরে এনে এক মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে। তাতে আমিও একটি অংশ গ্রহণ না করে পারলাম না।

অভিনয় করলাম সামান্য—কিন্তু শিখলাম অনেক—আচ্ছা চলি, নমস্কার।

ইন্দ্রাণী ॥ দাঁড়ান ভোলানাথবাবু—আপনি অভিনয় করে থাকতে পারেন —আমি কিন্তু অভিনয় করিনি। এই অর্থসর্বস্ব সমাজকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি বলেই—আমি বাড়িতে থাকি না—সময় কাটাই বস্তিতে—যেখানে অতো দারিদ্র্যের মধ্যেও এখনও রয়েছে প্রাণ—এখনও রয়েছে মনুষ্যত্ব—এখনও রয়েছে সত্য! আপনি যাচ্ছেন যান—কিন্তু আপনাকে যা বলেছি—সত্যই বলেছি, মিথ্যা বলিনি—ভোলানাথবাবু। আপনার মত আর পথ—আমারো।

ভোলানাথ ॥ না, না, আমি তোমাকে এতটুকু ভুল বুঝিনি ইন্দ্রাণী। আমি আবার আসব—আবার এসে তোমার পাশে দাঁড়াব—হাত ধরব—সেদিন—যেদিন আমি তার যোগ্য হব। আর জেনো রাণী, সে যোগ্যতার জন্য সাধনা আজ থেকেই আমার হলো সুরু।

ভোলানাথের প্রস্থান

জগদ্ধাত্রী ॥ (ইন্দ্রাণীর কাছে আসিয়া) খুব শিক্ষা হ'ল মা

ইন্দ্রাণী ॥ আমি কিছু মিছে বলিনি মা।

জগদ্ধাত্রী ॥ সে-আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি। এখন নাবি—খাবি আয়—

ইন্দ্রাণীকে লইয়া জগদ্ধাত্রী অন্দরে চলিয়া গেলেন। সিংহ তাঁহার পকেট হইতে খবরের কাগজটি বাহির করিয়া একবার দেখিলেন—পরে কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—দেখাদেখি শম্ভু ঐ ঘরে রক্ষিত অন্যান্য কাগজগুলি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।—

সিংহ টেলিফোনটি তুলিলেন

সিংহ ॥ হ্যালো। কে? দেশবার্তা? বিজ্ঞাপন বিভাগ? কেন?······হ্যাঁ আমি প্রতাপচন্দ্র সিংহ···হ্যাঁ বলুন! কি হয়েছে?···আপনাদের

অফিস ঘেরাও করেছে? কারা?…কি? পথ থেকে সব পাগল ধরে এনেছে? এঁ্যা! শ'পাঁচেক পাগল! তাদের ধরে এনেছে সব লোকেরা!…ও বুঝেছি, সেই ক্রোড়পতির নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন! এঁ্যা! সবাই লক্ষ টাকা পুরস্কার চাইছে! তা বেশ তো!—দিয়ে দিন না মশাই! এঁ্যা…আমি দেব? কেন মশাই? কেন মশাই, আমার অপরাধ?…বক্স নাম্বার দিয়ে বিজ্ঞাপনটা আমিই দিয়েছি!… বলেন কি মশাই?…না না, সে কি! সে কি করে হয়!…কি?… বিজ্ঞাপনে আমার পাবলিসিটি অফিসার শঙ্খ সরকারের সই! আমার নামে বিজ্ঞাপনের বিল হ'য়েছে? না, না, শুনুন, দয়া করে শুনুন দোহাই মশাই—ঐ পাঁচশ' পাগল আমার বাড়ি লেলিয়ে দেবেন না। কি কি বল্‌ছেন মশাই?…তা' না হ'লে আপনারা বাঁচেন না!…ওরে বাবা! আপনারা যদি না বাঁচেন—আমি কি ক'রে বাঁচব!—আমাকে ঘর ছাড়া ক'রলেন আপনারা মশাই—করুন! (ফোনটি রাখিয়া) শঙ্খ! তোমার এই কীর্তি! তোমাকে আমি জেলে দেব।

শঙ্খ ॥ তা'তে আমার দুঃখ নেই সার। আপনি বলেছিলেন—দয়ার পাত্র বুঝেই আপনি দয়া করেন—স্বার্থের জন্যে নয়—ব'লেছিলেন আপনার দান-ধ্যানের সঙ্গে স্বার্থের কোনো সম্বন্ধ নেই—চোখে আঙ্গুল দিয়ে আজ বোধ হয় আপনাকে দেখাতে পেরেছি আপনার সে কথা মিথ্যে!

সিংহ ॥ Scoundrel! Rascal! তোমাকে আমি গুলি করে মারব।

ঘরের বাহিরে কোলাহল শোনা গেল। সেই কোলাহলে ছাপাইয়া উঠিল—দশরথের কণ্ঠ

দশরথ ॥ না, না—বাবা সব—গোলমাল কোরো না—আমার সাহেব গোলমাল সইতে পারেন না। সবাই আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে এসো! এখন চা-টা দিচ্ছি—দুপুরে পোলাও—মাংস!

বলিতে বলিতে একদল পাগল-প্রায় ভবঘুরে লইয়া দশরথের প্রবেশ

দশরথ ॥ পথ থেকে খুঁজে পেতে অনেক বাছাই করে ধরে এনেছি সার— এদের মধ্যে কেউ না কেউ, হবেই হবে। (দলবলকে) বোসো, বোসো—তোমরা সব বোসো !

সিংহ ॥ (শঙ্খকে—বিপন্ন হইয়া) শঙ্খ ! আমায় বাঁচাও বাবা।

শঙ্খ ॥ আপনি কিছু ভাব্‌বেন না সার। এ-কজনকে আমি ম্যানেজ ক'রতে পারব। কিন্তু দেশবার্তা অপিস চড়াও করেছে যে-পাঁচশ'— তাদের যদি এখানে লেলিয়ে দিয়ে থাকে, তবে আর রক্ষে নেই সার !—সে-দল এসে পড়বার আগেই আপনি সস্ত্রীক স-কন্যা পাড়ি দিন—একেবারে সোজা শ্বশুর বাড়ি।

সিংহ ॥ যা' করতে হয়—করো বাবা ! খিড়্‌কির দোর দিযে আমরা বেরিয়ে পড়ছি।

সিংহের অন্দর অভিমুখে প্রস্থান

শঙ্খ ॥ দশরথ। হাঁ করে দেখছ কি। চা আনো—খাবার দাও—আজ কলকাতার ঘরে ঘরে দরিদ্র-নারায়ণের পূজার লগ্ন এসেছে ! এই এই মহালগ্ন যতক্ষণ আছে—এসো ভাই সব—আমরা সকলে মিলে তা' সার্থক করি ! বসুন—আপনারা সবাই বসুন।

শঙ্খ ভবঘুরেদের টানাটানি করিয়া বসাইতে লাগিল। দেখা গেল ইন্দ্রানী অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে একঝুড়ি খাবার লইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের উদ্দাম আনন্দ। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল৹

যবনিকা

শারদীয়া সংখ্যা
স্বাধীনতা
১৩৬৩

রক্ত কদম

—পটভূমিকা—

পশ্চিম বাংলার কয়লার খনি-অঞ্চলে পাহাড়তলির এক উঁচু টিলার উপর কুলি সর্দার মংলুর বাসাবাড়ি। ঠিক তাহার নিচেই কুলিদের ব্যারাক এবং তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ছোটখাটো দোকান।

অপরাহ্ণ। মংলু সর্দারের ঘরখানিতে মংলু সর্দারের যুবতী স্ত্রী 'কদম' একখানি ছোট আয়না সামনে রাখিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গান গাহিতেছিল এবং বারবার উন্মুক্ত দরজার দিকে তাকাইয়া কাহারো আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

—গান—

শাল গাছে শাল পঙ্গড়া
কদম গাছে কলি রে—
বঁধার গায়ে লাল গামছা
ছুটক দেখে মরি রে।

কোলিয়ারির "হাজরি-বাবু' মোহন মিত্রের প্রবেশ। বয়স বছর ত্রিশ। প্রসাধনের পরিপাট্য আছে। ঢেউ তোলা চুল। বগলে একটি খাতা

কদম ॥ (অভ্যর্থনা জ্ঞাপক হাস্যে)···হাজরিবাবু ! মোহনবাবু !

মোহন ॥ আরে এ সর্দারনী—তু আজ আবার গরহাজির !

কদম তাহাকে দেখিয়া মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া গানটি গাহিয়াই চলিল। সমীহ করিল. শুধু এইটুকু যে গলার স্বরটি উঁচু পর্দা হইতে নীচু পর্দায় নামাইয়া আনিল

—গান—

সাঁঝে ফুটে ঝিঁগা ফুল
সকালে মলিন রে—
আজ বঁধা ছেড়ে গেলে
পরের অধীন রে।
এতদিন যে দেখি কালার কানে
জবার ফুল,
আজ কেন কালার বদন
মলিন রে—।

মোহন ॥ ওতে আমি ভুলছি না। আজ কাজে যাস্‌নি কেন কদম!

কদম ॥ তু আস্‌বি বলে।

মোহন ॥ একটা দিনের হাজরী কাটা যাবে না তোর!

কদম ॥ যাবে না। যদি যাবে, তু দিবি।

মোহন ॥ আমি না হয় দেবো, কিন্তু তোর মানুষটা—সে তো তা জান্‌বে না। একটা দিন গর-হাজির হলি, মংলু সর্দার তোকে ছাড়বে না। আজ তোকে পিট্‌বে।

কদম ॥ (হাসিয়া) পিট্‌বে না। (গা মোড়ামুড়ি দিয়া) হামি ব'লবে হামাব বেমারি হ'লো—ও শুন্‌বে তো ওর মাথাটা ঘুবে যাবে—চোখে আঁধার দেখ্‌বে—পাখা আনবে—হামাকে হাওয়া ক'ববে—হামার গা টিপবে—পা টিপ্‌বে।

মোহন ॥ তোর কি সত্যি বেমারি হ'লো কদম!

কদম ॥ না

মোহন ॥ না—না—সত্যি বল্‌। আমি তোকে হাওয়া ক'রছি—ক'রবো?

কদম ॥ কর। (হাসিয়া) তোর মাথাটা যদি যাবে—আমার দোষ না দিবি।

মোহন ॥ মাথাটা যাবে! কেন, তুই আমাকে মারবি না কি!

কদম ॥ হামি না মারবে—মারবে আমার সর্দার। উ ত এখন ঘরে ফিরবে! তু হামাকে হাওয়া করছিস—উ দেখবে ত তুর মাথাটা লিবে না?

মোহন ॥ তোর মতলবটা আমি বুঝি না কদম! সে দিন তুই আমাকে ব'ললি, চল্ বাবু, ক'লকাতা চল্ তা' তোর যাওয়ার কোনো মতলব দেখছি না তো কদম। যাবি না তুই কোলকাতা?

কদম সঙ্গে সঙ্গে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া গান ধরিল

—গান—

হুগলী হাবড়া নিতুমতেগী মারাংয়া
সিহুড়ী কোলকাতা সহর বাজার·
সরসগিয়া
হাবড়া ক্ষণ হো সিহুড়ী ক্ষণ হো
মাণ্ডাওয়ালে তার দো জ্যেদাগিয়া
আখরালাতার তার দো জ্যেদাগিয়া।

এমন সময় বাহিরে একটা শব্দ শোনা গেল। ঘরের ভিতর ইহারা দুজনেই চমকিয়া উঠিল। মোহন চট্ করিয়া দরজায় গিয়া দাঁড়াইল—কিছু দেখিতে না পাইয়া, ফিরিয়া আসিল

কদম ॥—কে?

মোহন ॥ কেউ না।

কদম ॥ তুই আমার গানটা বুঝলি বাবু?

মোহন ॥ সবটা বুঝলাম না।

কদম ॥ হুগলী, হাবড়া, সিহুড়ী, কোলকাতা—খুব বড়ো সহর আছে।—তা' উদের নামটাই বড়ো। আমরা যেখানে বসে আছি—আমাদের এই গ্রামটা, এর চেয়ে কিছু বড়ো না আছে।

মোহন ॥ দূর পাগলী! এই কথা ব'লে সর্দ্দার বুঝি তোকে ভুলিয়েছে?

ছিঃ—ছিঃ! ঝুট্ বাত ব'লেছে। আমার ক'লকাতার মতো সহর দুনিয়ায় না আছে। ওখানে গঙ্গা নদী আছে। অতো বড়ো নদী তুই কোথায় দেখ্লি! গঙ্গার উপুর যে পোলটা আছে, ও দেখ্লে তো তোর মাথা ঘুরবে!

কদম ॥ মাথা ঘুরবে ত আমি দেখ্বে না।

মোহন ॥ না—না, ওটা দেখলে মাথা ঘুরবে না—না দেখ্লে ঘুরবে।

কদম ॥ তবে আমি দেখবে! আর কী আছে বল্না বাবু?

মোহন ॥ কতোবার তোকে ব'লবো?

কদম ॥ না—না, আবার বল্ বাবু। কোলকাতার কথা যখন তুই বলিস্ বাবু, আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয—মনটা কেবল ব'লবে, চল্ কদম চল্—কলকাতা চল্—বুধু—ওরাও কোলকাতা দেখলো—উ আমাকে ব'ললো, উখানকার সব বাড়ি উ আকাশ ছুঁলো। যাদুঘর দেখলো—চিড়িয়াখানা দেখ্লো—সাহেব দেখলো—মেম দেখলো। আমিও দেখবে।

মোহন ॥ (ফিস্ ফিস্ করিয়া) দেখবি তো চল্।

কদম ॥ যাবে—সর্দারের সাথে আমি যাবে।

মোহন ॥ সর্দার গেলে কবে যেতো। সর্দার ত বলে, কোলকাতায় দানা আছে, পরী আছে—যে ওখানে যাবে—হয মরবে—না হয় ভেড়া বনবে।

কদম ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর্দার ত ওই কথা ব'লবে—উ কথা কেন বলবে, জানিস বাবু?

মোহন ॥ না, কেন?

কদম ॥ কোলকাতা গেলে ওর অনেক খরচ হবে—অনেক টাকা খ'সবে। লোকটা এমন কিপ্টা আছে, জানিস্ বাবু!

মোহন ॥ জানি—জানি। তোকে একটা সোনার হার দিলো না—ভালো একটা গয়না দিলো না। কাঁচের চুড়ী, বনের ফুল আর জংলা শাড়ী—এতেই তুই ভুললি কদম।

কদম ॥ না—না, আমি ওতে না ভুললাম। ওর তাগদ দেখে আমি ভুললাম। অমন জোয়ান, এ-মুলুকে কে আছে—বল্!

মোহন ॥ ও বাত ঠিক আছে—তাই ও সর্দার হ'লো—একশ' টাকা ওর তলব হ'লো—তাতে কি আছে! ও যা তলব পাবে, বুদ্ধির জোরে আমি তা উপরি পাবে। আর তার ওপর আমি দেড়শ' টাকা তলব পাই। পাই কি না বল্?

কদম ॥ পাস্—আমি জানে বাবু তা' তুই পাস্। তোর তাগদ না আছে—তবে বুদ্ধিটা আছে খুব। দেখতেও তুই ভালো আছিস্ বাবু—কথাটাও তোর মিষ্টি আছে—তু যখন আমার দিকে তাকাল আমি পাগলা হই বাবু—(একটু থামিয়া) আমি কি ভাবি জানিস বাবু?

মোহন ॥ কি ভাবিস্ কদম?

কদম ॥ এমন একটা লোক—যে তাগদটা পেলো আমার সর্দারের আর বুদ্ধিটা পেলো তোর—যে দরদটা পেলো আমার সর্দারের—আর চেহারাটা পেলো তোর—যে ধরমটা পেলো আমার সর্দারের—আর রোজগারটা পেলো তোর—এমন একটা লোক আমার খসম কেন হোলো না!

মোহন ॥ দূর পাগলী, তা কখনো হয়!···আমি কি ভাবি জানিস কদম?

কদম ॥ কি ভাবিস্ বাবু?

মোহন ॥ আমার এতো বুদ্ধি—আমার এতো টাকা সব মিছা হোলো। —কেন জানিস কদম?

কদম ॥ কেন বাবু?

মোহন ॥ তোকে আমি পেলাম না, তাই!

কদম ॥ আমাকে নিয়ে তু ঘর করবি বাবু?

মোহন ॥ ঐ তো আমি চাই কদম!

কদম ॥ আমাকে কোলকাতা নিবি বাবু?

মোহন ॥ এতো টাকা তবে আমি কেন জমালাম কদম!

কদম ॥ আমার সর্দার তোকে খুন করবে বাবু।

মোহন ॥ পারবে না। যার বুদ্ধি আছে—যার টাকা আছে—তাকে কে ছোঁবে!

কদম ॥ ও বাত ঠিক আছে—আমি জানে বাবু।···আমার কি মন চায় জানিস বাবু?

মোহন ॥ কি কদম?

কদম ॥ তোর সাথে আমি পালাবো—সর্দারটা কি করে আমি দেখবো—ওকে আমার পিছু পিছু টান্‌বো। না—না—তোর ভয় নেই বাবু—আমি ধরা না দেবো—আমি তোর আড়ালে থাক্‌বো।

মোহন ॥ আমার আড়ালে নয় কদম—আমার বুকের ভেতর তোকে রাখবো।

কদম ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমি সেখান থেকে ওকে দেখবো—ও আমাকে দেখবে না।

মোহন ॥ (চুপি চুপি) চল্‌ তবে আজ।

কদম ॥ আজ!

মোহন ॥ হ্যাঁ, আজ। কাল থেকে এ-ক'দিন পুজার ছুটি আছে—আজ রাতে চ'লে গেলে কেউ কিছু ভাববে না।

কদম ॥ তারপর?

মোহন ॥ তারপর কোলকাতা। কোলকাতায় অমরা হারিয়ে যাবো। লাখো লাখো লোকের মাঝে কেউ আমাদের খোঁজ না পাবে। আমি ওখানে চাকরি ক'রবো—তুই আমার ঘর ক'রবি—ঘর দেখবি—কোলকাতা সহর দেখবি—আর অবাক হ'বি—

কদম ॥ তোর কথা শুনে আমার গা-টা কাঁটা দেয়। পালাতে আমার খুব সখ বাবু—কখন যাবি?

মোহন ॥ আজ রাতে—সর্দার যখন খাদে নাম্‌বে—ওভার-টাইম কাজের তদ্বির ক'রতে—তখন।

কোলিয়ারির ভোঁ বাজিয়া উঠিল। ইহারা দুইজনেই চমকিয়া উঠিল।

কদম ॥ তুই পালা বাবু—সর্দারের আসবার সময় হ'লো।

মোহন ॥ হ্যাঁ, সর্দার আস্‌বে। ও যখন আবার যাবে খাদে, তুই লণ্ঠনটা জ্বালবি—তোর খোলা জানালায় বসিয়ে দিবি—দূরে অন্ধকারে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো, জানলায় যেই দেখবো লণ্ঠন জ্বলছে, আমি এসে তোকে নিয়ে যাবো। কিচ্ছু নিতে হবে না তোর—ভালো একটা শাড়ী প'রে তৈরী থাকবি—থাকৃবি তো কদম!

কদম ॥ (আনন্দে) থাকবো···থাকবো—আঁধার রাতে তোর হাত ধ'রে আমি পালাবো বাবু—আমি পালাবো।

মোহন ॥ লক্ষী—তুই আমার লক্ষী! চলি।

মোহন যাইবার জন্য ছুটিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিল

কদম ॥ এ কি! তুই ফিবলি যে বাবু।

মোহন ॥ তোকে দেখলে আমার সব ভুল হয়! তোর জন্যে এনেছিলাম দুটো ফুল—বাইরে গিয়ে পকেটে হাত দিতেই দেখলাম তোকে দিতে ভুলে গেছি আমি– নে।

হাতের কদম ফুল দুটি দিল

কদম ॥ কদম ফুল!

মোহন ॥ হ্যাঁ কদম!—যে ফুলের জন্যে আমি জান্‌ দিতে পারি। ভুলিস নি কদম—আমার চোখ দুটো প'ড়ে থাকবে তোর ঐ জানলায়—লণ্ঠনের আলোর আশায়।

মোহন বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কদম ফুল দুটি বুকে চাপিয়া পরে ফুল দুটি মাথায় গুঁজিয়া লণ্ঠনটি ঘরের তাকে রাখিল—এসবই সে গান গাহিতে গাহিতে করিল

সাঁঝে ফুটে কদম ফুল
সকালে মলিন রে—
আজ বধা ছেড়ে গেলে
পরের অধীন রে !
এতদিন যে দেখি কালার কানে
কদম ফুল—
আজ কেন কালার বদন
মলিন রে !

গানের শেষে কদম আয়নায় মুখ দেখিল—এবং ফুল দুটি মনের মতো করিয়া খোঁপাতে পরিল—ঠিক এমন সময় অন্ধকার হইতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘরে প্রবেশ করিল তাহার স্বামী মংলু সর্দার।

মংলু ॥ কদম ফুল।

কদম ॥ (চমকিয়া উঠিয়া বলিল) তুই।

মংলু ॥ এ-কদম ফুল তু কুথা পেলি কদম।

কদম ॥ কদম গাছটা দিলো—নইলে কি তু দিবি ?

মংলু ॥ কদম ফুল হামার এ-দিকে না হবে—হবে আসানসোলে—একটা ফুলওয়ালা আসানসোল থেকে আনবে—সাযেবদের বাংলোতে বেচবে—আজ আনলো—ভাবী একটা ঘটনা ঘটলো।

কদম ॥ কি ঘটলো।

মংলু ॥ হাজরী বাবুকে তু ত জানিস—যে বাবুটা তোর ঐ চাঁদপানা মুখখানা দেখলো আর মজলো।

কদম ॥ তা' মজলো। তাতে কি হ'লো।—তুই ভি মজলি। বুধু ভি মজলো ঝরু ভি মজলো ! তাতে কি হ'লো।

মংলু ॥ কি আবার হবে—হামার কান বাড়লো ! যে-মুখ দেখে সবাই মজলো—সে-মুখে চুমো খাবো হামি একেলা—

কদম ॥ তু থাম্। তু বল্—কি ঘটনা ঘটলো! হাজরি বাবুটা কি কাণ্ড করলো!

মংলু ॥ চুরি ক'রলো!

কদম ॥ কি চুরি ক'রলো!

মংলু ॥ দুটো কদম ফুল। ফুলওয়ালাকে উ ডাকলো—কদমগুলো হাতে তুলে নিলো—দরদাম করলো—দাম শুনে চমকে উঠলো—বললে, না না—হামি নেবে না—ফুলগুলো ফেরত দিলো—ফুলওয়ালা কদমগুলো গুণে দেখলো—দুটো কদম কম আছে—আর দেখলো হাজরি বাবুর পকেটটা উঁচু আছে—ভয়ে সে মুখ ফুটে কুছু ব'ললে না—বাবুটা যে-ই চ'লে গেলো—ফুলওয়ালা হামাদের কাছে নালিশ করলো।

কদম ॥ ঝুট বাত। ওর টাকা আছে—ও চুরি করবে কেন?

মংলু ॥ ওর যে-টাকা আছে—চুরির টাকা—ঘুষের টাকা—ও চুরি না করবে, ত কে করবে!

কদম ॥ ঝুট বাত।

মংলু ॥ ও যদি চুরি না করবে—তবে তু চুরি করলি কদম—আর তু যদি চুরি না করবি—তবে এ ফুল তু কুথা পেলি!

কদম ॥ হামি ঝুট্ না বলবে—হাজরি বাবু হামাকে দিলে!

মংলু ॥ ফুল চুরি করলে- তোর মন ভি চুরি করলে। ফুল নিয়ে লুকিয়ে ও এখানে এলো—কুলি লোক তাই ওকে ধরতে পারলো না। ও যেই ঘর ফিরবে—দেখবে ফুলওয়ালা আর কুলি লোক, ওর ঘর ঘেরাও করবে।

কদম ॥ কুলি লোক! ওর ঘর ঘেরাও করবে কেন?

মংলু ॥ ওকে মারবে—তাই। গরীব গরীবকে দেখবে না তো কে দেখবে!

কদম ॥ হামি চললাম!

মংলু ॥ কুথা ?

কদম ॥ গরীব গরীবকে দেখবে। ফুলওয়ালাকে এ-ফুল হামি ফেরত দেবে।

খোঁপা হইতে ফুল দুটি খুলিয়া হাতে লইল এবং বাহিরের দিকে পা বাড়াইল

মংলু ॥ তাতে তোর মন-চোর বাঁচবে না।

কদম ॥ বাঁচবে কি না—দেখিস।

মংলুর অট্টহাস্য। কদম তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। মংলুও বাহিরের দিকে ছুটিল এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। কিন্তু তাহার ক্ষণকালের জন্য। কিছুপরেই মংলু ঘরে ফিরিয়া আসিল। এই ক্ষণকালের মধ্যেই তাহার চেহারায় একটি রুদ্রমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে প্রথমে জানালাটি খুলিল। কিছুক্ষণ বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। তৎপর দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে জানালা হইতে চলিয়া আসিল—দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে লণ্ঠনটি মুখের সামনে ধরিয়া তাহার দীপশিখাটি উজ্জ্বলতর করিল। পরে লণ্ঠনটি লইয়া ধীরে ধীরে জানালার দিকে অগ্রসর হইল—এবং জানালার কাছে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া লণ্ঠনটি জানালায় বসাইয়া দিল। তৎপর সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া উন্মুক্ত একপাটি দরজার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া রহিল—এবং শিকারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে নিঃশব্দে পদসঞ্চারে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল মোহন। মোহন নিম্নস্বরে কদমকে ডাকিল—

মোহন ॥ কদম! কদম!

পশ্চাৎ হইতে মংলু মোহনের গলা টিপিয়া ধরিল। অস্ফুট আর্তনাদে মোহন ভূপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মংলু তাহাকে ছাড়িয়া ছুটিয়া গেল জানালায় এবং লণ্ঠনটি নির্বা-পিত করিল। অন্ধকার কক্ষে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। ক্ষণপরে বোঝা গেল তথায় ছুটিয়া আসিল কদম

কদম ॥ একি ! ঘরটা আঁধার কেন ?

একটি দিয়াশালাইয়ের কাঠি জ্বলিল। সেই আলোতে চকিতে দেখা গেল উহা জ্বালিয়াছে মংলু। সে লণ্ঠন জ্বালিতে ব্যস্ত। লণ্ঠনটি যে তাকে ছিল সেখানেই রহিয়াছে দেখা গেল। মংলুর মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন—আশ্চর্যরূপ শান্ত। লণ্ঠনটি জ্বালা হইল—কিন্তু মোহনের দেহ দেখা গেল না—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়

কদম ॥ তু আঁধার ঘরে ছিলি।

মংলু ॥ মনটা যদি আঁধার হবে—ঘরটা আঁধার হবে না কদম ! কি হ'লো বল্—তোর হাজরি বাবু বাঁচলো !

কদম ॥ জরুর বাঁচবে—কেন বাঁচবে না ! তোর সব বাত ঝুটা আছে—হাজরিবাবুব কুঠি খাঁ খাঁ করছে—না আছে হাজরিবাবু, না আছে একটা আদমি ! তোর বাত ঝুটা—তু ঝুটা।

মংলু ॥ আর তু সাঁচ্চা আছিস ?

কদম ॥ জরুর—সাঁচ্চা আর ঝুটা একসাথ আর না থাকবে—থাক্ তুই—হামি চল্‌লাম।

মংলু ॥ কুথা যাবি ?

কদম ॥ আমার যেখানে খুসী।

মংলু ॥ পুজাব ছুটিতে বেড়াতে যাবি কদম ?

কদম ॥ যাবে।

মংলু ॥ কোলকাতা যাবি ?

কদম ॥ জরুর যাবে।

মংলু ॥ আজ রাতে যাবি ?

কদম ॥ আভি যাবে।

মংলু ॥ হামার সাথ যাবি ?

কদম ॥ না।

মংলু ॥ হাজরি বাবুর সাথে যাবি ?

কদম ॥ হাঃ—যাবে।

মংলু ॥ তবে লণ্ঠনটা জানালায় দে। তবে তো উ আসবে।

কদম ॥ তু আছিস—উ কেনে আসবে! হামি যাবে।

মংলু ॥ না না কদম—হামি চললাম—তু থাক্—হামি উকে আনছি।

লণ্ঠনটি জানালায় রাখিতে গেল। কদম মংলুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাধা দিল এবং জোর করিয়া লণ্ঠনটি নিজেই নিভাইয়া দিলো

মংলু ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ! তোর ভয়—জানালায় লণ্ঠন রাখলে উ ভাববে হামি নাই, তু উকে ডাকছিস্। উ আসবে—হামি উকে মারবে। লণ্ঠনটা তাই তুই নিভালি। না কদম—সে-ভয় তোর নাই—উ এখানে আসিযা গেছে—উ এখানেই আছে—উ তোর এই ঘরেই আছে—তোর বিছানাতেই আছে—কম্বলের আড়ালে সরমে মুখ ঢাকিয়া আছে—আর সরম কেন! উ যখন এল—হামিই চললাম—চললাম কলকাতায়—লাখো লাখো লোকের মাঝে হামি হারিয়ে গেলাম। তুরাই থাক—হামি চললাম।

সেই নিদারুণ অন্ধকারের মাঝেও বোঝা গেল মংলু চলিয়া গেল—হয়তো জন্মের মতো। ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। হঠাৎ সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া কদমের চীৎকার শোনা গেল—

কদম ॥ বাবু—বাবু—হাজরি বাবু! তু কথা বল্! তু কথা বল্!

—যবনিকা—

দীপালী
শারদীয়া সংখ্যা ঃ
১৩৬৪

অসাধারণ

দক্ষিণ কলিকাতায় বড়রাস্তার ধারে একতলা একটি বাড়ি। গৃহস্বামী শ্রীপবিত্র বসু এম-এ, পি-আর-এস, কোনও কলেজে বাঙলা ভাষার অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার পরীক্ষক। স্ত্রী অমলা, পুত্র অমিয় ও কন্যা কৃষ্ণাকে লইয়া অধ্যাপক বসুর ক্ষুদ্র সংসার। সন্ধ্যা। অধ্যাপক বসু লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া ফোনে কাহার সহিত আলাপ করিতেছেন

পবিত্র ॥ হ্যাঁ, আমি পবিত্র বোসই কথা বলছি।…হ্যাঁ, এইমাত্র বাড়ী ফিরছি। হ্যাঁ, বি-এর রেজাল্ট আজ বেরিয়েছে।…তা ঠিক্, এবার পাশের পার্সেন্টেজ খুব কম।…হ্যাঁ, অমিয়, আমার ছেলে—পাশ করতে পারে নি। কম্পালসরি বাঙলার পরীক্ষক আমিই ছিলাম বটে,…না, আমি কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়েছিলাম আমার ছেলের কাগজ যেন অন্য পরীক্ষককে দেওয়া হয়।…না…এ আর আশ্চর্য কি—এইটেই আমার কর্তব্য ছিল।…আপনার ছেলেও পাশ করতে পারে নি! শুনে দুঃখিত হলাম। আমার কাছেই কাগজ পড়েছিল?…তা হবে…কিন্তু তা তো আমার জানবার কথা নয়।… না মশাই না। নমস্কার।

টেলিফোনে এই কথোপকথনের মধ্যে কৃষ্ণা এক গ্লাস ওভালটিন লইয়া আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে

পবিত্র ॥ এ কি মা! চা কই?

কৃষ্ণা ॥ চা আর তুমি পাবে না বাবা। এখন থেকে তোমাকে দুবেলা ওভালটিনই খেতে হবে—ডাক্তারের হুকুম।

পবিত্র ॥ ওটা তবে ওভালটিন?

কৃষ্ণা ॥ হ্যাঁ বাবা।

পবিত্র ॥ অত দাম—জুটলো কোত্থেকে?

কৃষ্ণা ॥ সে আমি জানি না বাবা। মা আনিয়েছেন।

পবিত্র ॥ বেশ-বেশ। চা-টা এমন নেশা—কিন্তু ধাতে আর সইচে না। ছাড়া উচিত—বুঝি, কিন্তু, ছাড়তে পারছি কই, ওভালটিনের পয়সা কোথায়?···একদিন দুদিন চলে, কিন্তু রোজ তো আর চলবে না।

কৃষ্ণা ॥ খাবেতো এক গ্লাস ওভালটিন: তার জন্য এত ভাবছ কেন বলতো। তুমি খেয়ে ফেলো—

পবিত্র ওভালটিন খাইতে লাগিলেন

পবিত্র ॥ তা খেতে বেশ। (হাসিয়া) এক টিন ওভালটিন কিনে তোমাদেব দুধের ববাদ্দটা বোধ হয় উঠিয়ে দিলেন তোমার মা।

বাহির হইতে পুত্র অমিয়ের প্রবেশ—গায়ে সন্ত কেনা দামী বুশ কোট—ট্রাউজার। হাতে রঙীন সিনেমা-পত্রিকা

পবিত্র ॥ ব্যাপার কি অমিয? এত ঝকৃঝকে তকৃতকে নতুন পোশাক গাযে তুলেছ যে!

অমিয। কিনলাম বাবা। অনেক দিনের সাধ পূরল।

পবিত্র ॥ কিন্তু দাম পড়ল কত?

অমিয ॥ সবশুদ্ধ উনষাট টাকা পনেরো আনা।

পবিত্র ॥ পেলে কোত্থেকে?

অমিয ॥ কেন! মা দিয়েছেন।

পবিত্র ॥ কিন্তু, তিনি পেলেন কোথায় ?

অমিয় ॥ তুমি দিয়েছ।

পবিত্র ॥ আমি দিয়েছি ! কোথায় পাব ?

অমিয় ॥ সে আমার জানবার কথা নয় বাবা।

পবিত্র ॥ হ্যাঁ, আমারি জানবার কথা। তিনশো টাকা যার বেতন, তার ছেলের গায়ে উঠবে ষাট টাকার পোশাক ! তোমার মা কোথায় কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা ॥ রান্নাঘরে বাবা।

পবিত্র ॥ যাকে হাত পুড়িয়ে দুবেলা রাঁধতে হয়, তার ছেলের গায়ে—তাও এমন দিনে—!

(অমিয়ের প্রতি) তোমার বি-এ ফেল করবার লজ্জাটা ঢাকবার জন্যই বুঝি তোমার ঐ সজ্জা অমিয় ?

অমিয় ॥ বাপ হয়ে নিজে আমার বাঙলার কাগজ না দেখে, অন্যের হাতে ফেল করিয়ে দিয়েছ তুমি—সেটা যখন সইতে পেরেছি, তোমার ও আঘাতও আমার সইবে বাবা।

পবিত্র ॥ সেটা ছিল আমার কর্তব্য। কর্তব্য পালন করেছি বলে যদি তুমি দুঃখিত হও, তাতে আমি দুঃখিত নই।

অমিয় ॥ বেশ তো ফেল করেছি বলেও আমার কোন দুঃখ নেই। তুমিই তো বল—Failures are but the pillars of success !

অমিয় বীরদর্পে অন্দরে চলিয়া গেল

পবিত্র ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ……এসব কী হচ্ছে ! কী হচ্ছে এসব ! তোমার মায়ের প্রশ্রয়ে—আর তিনি এত টাকা পেলেনই বা কী করে ! এই, মাসের শেষে ?…তুই বলতে পারিস মা ?

কৃষ্ণা। তা তো জানি না বাবা। মা আজ আমাকেও একটা খুব ভালো শাড়ি কিনে দিয়েছেন।

পবিত্র ॥ তোর ভালো শাড়ি ছিল না আমি জানি,—দেখেছি। আসচে মাসে মাইনে পেলে কিনে দেব বলেছিলাম। তিনি কিনে দিয়েছেন ভালই করেছেন। কিন্তু এসব টাকা পাচ্ছেন কোথেকে—আমি সেইটেই বুঝে উঠতে পারছি না মা।

কৃষ্ণা ॥ আমিও না।

পবিত্র ॥ অবিশ্যি তোমার মা মাঝে মাঝে আমাকে অবাক করে দেন—রীতিমতো চমকে দেন আমাকে। হিসেব করে চলেন বলেই পারেন, আর কতকটা পারেন নিজেকে বঞ্চিত করে—পান আর জরদা খাওয়াটা ছিল অত কালের নেশা—টানাটানি দেখে দিলেন সেটা ছেড়ে। একটা ভালো শাড়ি, একটা নতুন গয়না, মাঝে মাঝে সিনেমায় নিয়ে যাওয়া, এসব কিছুই আমি পারিনি—মুখ ফুটে বলেন না অবিশ্যি কিছু—কিন্তু · আমিই বা কি করব! সম্বল তো মাস গেলে তিনশোটি টাকা।

কৃষ্ণা ॥ তাই বা কি কম! চলে যাচ্ছে তো।

পবিত্র ॥ চলে যাচ্ছে মানে একটা লড়াই চলছে—কোনও মতে বেঁচে থাকবার একটা লড়াই। একদিন নয়—দুদিন নয়, রোজ। পারতাম না, ভেঙে পড়তাম, মা, শুধু তোরা মুখ বুজে সব সয়ে যাচ্ছিস বলেই ভেঙে পড়িনি। শাড়িটা তোর পছন্দ হয়েছে তো মা? কই? কোথায়? আন দেখি—প'রে আয়—

কৃষ্ণা ॥ না বাবা। অত দামী শাড়ি—ও আমায় মানাবে না বাবা!

পবিত্র ॥ সে কি? কত দাম?

কৃষ্ণা ॥ ঐ যে নতুন উঠেছে—ফিল্ম স্টার শাড়ি—দামী সিল্ক! দাম খুব কম করেও ষাট টাকা। আমি তো ফিল্ম স্টার নই বাবা। কলেজে যাবার জন্য দরকার ছিল আমার খান দুই আটপৌরে শাড়ি—তা হলো না।

পবিত্র ॥ না—না, আমায় উঠতে হ'ল। কী হচ্ছে এ সব? এ সব কী হচ্ছে!

উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্দর হইতে অমলা দেবীর প্রবেশ

অমলা ॥ কী আবার হচ্ছে! দপ করে জ্বলে উঠলে যে!

পবিত্র ॥ এই সব খরচপত্র—অযথা অন্যায় এসব খরচপত্র—কী করে হয়—যেখানে তুমি রয়েছ! আর এসব টাকা এলই বা কোত্থেকে?

অমলা ॥ হিসাব তো তুমি কোন দিনই চাওনি—আজ চাইছ যে!

পবিত্র ॥ আমি বুঝছি না—বুঝতে পারছি না—এত সব টাকা এল কোত্থেকে? কোত্থেকে এল?

অমলা ॥ যেখান থেকে আসার—সেখান থেকেই এসেছে—আমার বাপের বাড়ী থেকে আসেনি।

কৃষ্ণা ॥ আমি খাবার যোগাড় করব মা?

অমলা ॥ রান্না এখনো শেষ হয় নি। পোলাওটা বোধহয় এতক্ষণ হয়ে গেছে। গিয়ে দেখ।

কৃষ্ণা চলিয়া গেল

পবিত্র ॥ পোলাও!

অমলা ॥ হ্যাঁ পোলাও। নরেশদা একদিন খেতে চেয়েছিলেন। আজ খেতে বলেছি। কোনদিনই একটু ভালো কিছু খাওয়াতে পারি নি তাঁকে। আজ তাই একটু আয়োজন করেছি। তুমি সেই কোন ভোজে কাটলেট খেয়ে এসে বলেছিলে একটাই দিল, দিলে আর একটা খেতে—সেই কাটলেটও করেছি আজ—আশ মিটিয়ে খেতে হবে তোমাকে। না—না গুরুপাক হবে না, দেখো তুমি। চারটি ভাত, মুরগির একটু ঝোল আর সেই সঙ্গে খান কতক

কাটলেট্‌···করেছি কাটলেট্‌—এতে তোমার কোন অসুখ হবে না দেখো!

পবিত্র ॥ কী ক'রে তুমি এসব—এত সব···পারো, তাই আমি ভাবি। আজ তবে তোমায় বলি, শোনো। সেদিনকার সেই ভোজে কবরেজি কাটলেট্‌ খেয়ে—সে যেন মুখে লেগে রইল। ভাবলাম তোমাদেরও খাওয়াতে হবে। গেলাম সেদিন কলেজ স্ট্রীটের সেই বড রেস্তোঁরাতে—চারটি কাট্‌লেট চাইলাম—প্যাকেটে পুরে দিল—দাম শুনে চক্ষু কপালে উঠল—ছ'টাকা। বললাম তবে যে শুনেছি একটাকা ক'রে। লোকটা বললে পথে ঘাটে তাই বিক্রি হয় বটে। দুটো টাকা কম পড়ল—ফেরত দিলাম—তা বলে কিনা—মিছি মিছি ভাজালেন—এ সব দোকানে আসেন কেন?

অমলা ॥ অসভ্য। ইতর। কেন তুমি কিনতে গিয়েছিলে! এই তো আমি করে দিচ্ছি আজ। এককুড়ি কাট্‌লেটে আমার দশ টাকা খরচ পড়েছে মাত্র—

পবিত্র ॥ দশ টাকা! এল কোথোকে ?···না-না অমলা—এতসব খরচ—মাসের শেষ—আমি ভেবে পাচ্ছি না—না না এসব বাড়াবাড়ি—এ সব আমাদের মতো ছা-পোষা গেরস্ত ঘরে চলে না—চলা উচিত নয়—

অমলা ॥ কী দোষ করেছি আমরা যে অন্তত একটি দিনও একটি বারও একটু ভালো খাবার—একটু ভালো পরবার সখ মেটাতে পারব না আমরা!

পবিত্র ॥ ক্ষমতায় যদি কুলোয় কেন পারবে না অমলা?

অমলা ॥ কেন কুলোবে না! কোন কুলোয় না। বিদ্যাবুদ্ধি কি তোমার কারো চেয়ে কম? এম. এ. পি-আর-এস এই যে এতবড় একটা ল্যাজ ঝুলিয়ে বেড়াও—তবে বল এর কোন দাম নেই! আর যদি দাম না-ই থাকে তবে কেন এই মিথ্যা ভড়ং? কেন তবে এই শিক্ষিত সভ্য সমাজে বাস করার এই প্রাণান্তকর মোহ? যে

সমাজে প্রতিটি মুহূর্তে চল্‌ছে বাঁচবার জন্য এই নিদারুণ লড়াই। যে লড়াইয়ে হারিয়ে ফেলেছি আমরা জীবনের সকল আনন্দ ও উৎসব। উত্তর দাও আমাকে—প্রফেসার বোস—উত্তর দাও—

পবিত্র ॥ Plain living and high thinking'—এই হলো গিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ। ৩০০৲ টাকা আমি বেতন পাই—এজন্য এই বেতন যথেষ্ট—অমলাদেবী।

অমলা ॥ তবে বলো, তুমি এযুগের লোক—প্রফেসর বোস! এ যুগের আদর্শ। 'Plain living and high thinking—একথা বল্‌লে তোমাদের পণ্ডিত নেহেরুও তোমাকে 'Zero' mark দেবেন। এ যুগের আদর্শ high·living and high thingking. Standard of living বাড়াবার জন্যই আজ সকল দেশ, সকল জাতির প্রয়াস। তাই এত Five year plan' Ten year plan' Twenty year plan. থাক তর্ক করতে চাই না আমি তোমার সঙ্গে। বাথরূমে তোমার গরমজল দেওয়া হয়েছে। স্নান করবে এসো। আজ সবএকসঙ্গেই খাবো।

পবিত্র ॥ ছেলে ফেল করলে সেজন্য উৎসব হয় এটাও বুঝি এযুগের সভ্যতা?

অমলা ॥ পাশ ফেলের কোন দাম নেই এযুগে। এ যুগের সভ্যতা হলো, যেন তেন প্রকারেন টাকা রোজগার এবং সেই টাকায় জীবনকে ষোল আনা উপভোগ করা।

পবিত্র ॥ অমলাদেবী! এ তুমি কি বলছো?

অমলা ॥ বড় দুঃখেই একথা বলছি প্রফেসার বোস। হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, এযুগে সাধুতার কোন দাম নেই। বিদ্যার কোন মান নেই। এটা কাঞ্চন কৌলিন্যের যুগ। চোখের উপর দেখেছি, সৎ, সাধু, সুবিদ্বান অধ্যাপক সপরিবারে শুকিয়ে মরছে। সমাজে তার নাই কোন প্রভাব, নাই কোন প্রতিপত্তি। চোর জোচ্চোর টাকার জোরে নাম কিনছে। খেতাব পাচ্ছে। সমাজে হয় তারই

অভিনন্দন, তারই অভ্যর্থনা। সমাজ আমাদের যা শেখাচ্ছে তাই আমরা শিখছি—প্রফেসার বোস। এ তোমার পুঁথিপড়া জ্ঞান নয়, এ আমাদের হাড়ে হাড়ে শেখা অভিজ্ঞতা। এতটুকু মিথ্যা বলিনি প্রফেসার বোস। ওঠো, চলো।

পবিত্র ॥ তুমি যাও। স্নান আজ আমি করবো না। খাবার দেওয়া হলে আমায় ডেকো।

অমলা ॥ আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমি জানি আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখার জন্য তোমার চেষ্টার অন্ত নাই। বিদ্যে, বুদ্ধিও তোমার কিছু কম নয়। সংসারের জ্ঞান ভাণ্ডার তোমার থিসিসে, তোমার রিসার্চ্চে সম্বর্দ্ধিতর হয়েছে। কিন্তু তোমার সমৃদ্ধি বেড়েছে কতটুকু? শরীর ভেঙে পড়েছে। টাকার অভাবে হয়নি তোমার উপযুক্ত চিকিৎসা, উপযুক্ত পথ্য। দুবেলা চায়ের বদলে একটু ওভালটিন, তাই আমি তোমায় দিতে পারিনি এতদিন। কিন্তু আর না—আর এসব সইবো না। আমি যাচ্ছি, তুমি এসো।

অমলার প্রস্থান

ফোন বাজিতে লাগিল। পবিত্র বোস ফোনটি তুলিয়া ধরিল

পবিত্র ॥ হ্যালো···কে? অনিল রায়? কাকে চান? অমিয়? হ্যাঁ বাড়ী আছে। ধরুন, আমি খবর দিচ্ছি—বেশ তো বলুন, কি বলতে হবে। ওঃ আপনারা তার জন্য বসে আছেন। কোথায়? ফারপোতে? এক্ষুনি তাকে যেতে বলছেন? বলবো। নমস্কার।

ফোন রাখিয়া দিলেন। বাহিরে যাইবার পোষাকে সজ্জিত হইয়া অমিয়ের প্রবেশ

পবিত্র ॥ অনিল রায় কে? তোমাকে ফোনে এক্ষুনি ডাকছিলেন।

অমিয় ॥ কেন! অনিল রায় কে তুমি চিনলে না বাবা? ব্যারিষ্টার মহিম রায়ের ছেলে। বি, এ, পাশ করলো এবার। কি করে যে পাশ করলো তাই ভাবি। সে আজ ফারপোতে আমাদের পার্টি দিচ্ছে। সেই পার্টিতেই আমি যাচ্ছি।

পবিত্র ॥ দাঁড়াও। মহিম রায়ের ছেলে অনিল রায়? হ্যাঁ ওর পেপার ছিল আমার কাছেই। রোল থারটি ফাইভ?

অমিয় ॥ হ্যাঁ বাবা, রোল থারটি ফাইভ। বাংলার 'ব' জানে না। ইংরেজী ছাড়া যে কথা বলে না, সে তোমার কাছে পাশ হলো?

পবিত্র ॥ সাট্ আপ। সে আমার কাছে পাশ করে নি। সে যে কে তাও আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু জানতে আমি বাধ্য হয়েছি। প্রকাণ্ড বড়লোক এরা। আমাকে ঘুস দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছিল ওরা অনিলকে। কিন্তু আমি—সে পাশ করেছে?

অমিয় ॥ শুধু পাশ করেনি। তার পাশের ভোজ খেতে আমি যাচ্ছি ফারপোতে।

অমলাদেবীর প্রবেশ

অমলা ॥ আমার ইচ্ছা ছিল না, এ ভোজে তুমি যাও। ইচ্ছা ছিল আজ আমরা সব একসঙ্গে খাবো।

অমিয় ॥ সে তো আমরা রোজই খাই মা। আজকের এ নেমন্তন্নটা এড়ানো গেল না। যাই আমার দেরী হয়ে গেছে।

প্রস্থান

অমলা ॥ এসো। খাবে এস।

পবিত্র ॥ খাওয়া চুলোয় যাক্। তুমি বসো অমলা। তোমার মনে আছে হয়ত, তোমাকে আমি বলেছিলাম, তোমার নরেশদা মহিম রায়ের ছেলে অনিল রায়কে পাশ করিয়ে দেবার জন্য আমাকে ধরেছিলো। তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুস দিতে চেয়েছিল। আমি নরেশকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সে যেন এ বাড়ীতে আর কখনও না আসে। সেদিন তুমি আমাকে সমর্থনই করেছিলে।

অমলা ॥ হ্যাঁ করেছিলাম।

পবিত্র ॥ সব খাতার নম্বরগুলো আমি যোগ দিয়ে তোমাকে দিয়েছিলাম চেক্ করতে। সেই সময় তুমিও দেখেছিলে—রোল থার্টি ফাইভ মানে ঐ অনিল রায়—আমার পেপারে পেয়েছিল মাত্র পনের।

অমলা ॥ পনেরো না একান্ন ?

পবিত্র ॥ একান্ন! তোমায় আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। পনেরো। এই নিয়ে কত কথা হলো। তোমার মনে পড়ছে না—

অমলা নীরব রহিল

পবিত্র ॥ তারপর ফি বছর যেমন তুমি করো, মার্কের ফরমগুলি তুমি পূরণ করেছিলে। আমি বিশ্বাস করে, তাতে সই দি। আমি বিশ্বাস করে এবার তাতে সই দিযে খাতাপত্র মার্কসিট সব পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ইউনিভারসিটিতে।

অমলা ॥ দিয়েছিলে।

পবিত্র ॥ সে পাশ হয়ে পাশের ভোজ খাওয়াচ্ছে বন্ধুদের আজ। তোমার ছেলে সেই ভোজ খেতে গেল। কী করে এটা হলো ? কী করে এটা হয় অমলা ?

অমলা নীরব রহিল

পবিত্র ॥ এ কাজ তোমার।

অমলা ॥ শোন—

পবিত্র ॥ না, না, প্রতিবাদ করো না। খাতা আর মার্কসীট খুললেই দেখা যাবে। পনেরো হয়েছে একান্ন তোমারই হাতে। নীচে সই আছে অবশ্য আমার। প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই অমলা। আমি সব বুঝেছি। নরেশের হাতের ঐ তিন হাজার টাকা তুমি

নিয়েছো। তাই আজ আমার মুখে উঠেছে ওভালটিন, ছেলের গায়ে উঠেছে ষাট্ টাকার পোশাক, মেয়ে পেয়েছে ষাট টাকার শাড়ী। তুমি হয়তো নিয়েছো একজোড়া বেনারসী। স্যাকরা হয়তঃ গয়নার অর্ডারও পেয়ে গেছে। আজ আমাদের জন্য রান্না হচ্ছে পোলাও, কালিয়া, কোর্মা, কাবাব—এই তোমার High living and high thinking...standard of living বাড়াবার চমৎকার পথ তুমি করে নিয়েছো তো!

অমলা ॥ নিয়েছি এবং আশ্চর্য, প্রফেসার, এজন্য আমার এতটুকু লজ্জা হচ্ছে না। অনুশোচনাও হচ্ছে না। কেন জানো প্রফেসার? এ ঘুস যে দিয়েছে, সে হচ্ছে, এই সমাজের একজন মাথা। অতবড় ব্যারিষ্টার! কত সভা সমিতির প্রেসিডেণ্ট। কাগজে কাগজে কত তাঁর জয়গান।

পবিত্র বোস উঠিয়া তাঁহার কোটটি পরিলেন। ছড়িটি হাতে লইলেন

অমলা ॥ এ কী? তুমি কোথায় যাচ্ছো?

পবিত্র ॥ এখন আমার যা কর্তব্য তাই করতে!

অমলা ॥ মানে?

পবিত্র ॥ আমি ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করবো।

অমলা ॥ বলবে তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে? যেখানে নিজের সই রয়েছে! বিশ্বাস করবেন তিনি এসব কথা?

পবিত্র ॥ করবেন না? • আমি সব খুলে বলবো, তবু করবেন না?

অমলা ॥ তবু করবেন না। শুধু বল্বেন, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে প্রফেসার বোস। তুমি একটি Fool, ছুটি নাও। চিকিৎসা করাও। এসব কেলেঙ্কারী ঘেটে আমি ইউনিভারসিটির বদনাম কিনবো না।"

পবিত্র ॥ হুঁ। (কোট খুলিয়া ফেলিলেন। ছড়িটি যথাস্থানে রাখিলেন। চেয়ারে বসিলেন!)

অমলা ॥ চল খেতে চলো। খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পবিত্র ॥ আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

অমলা প্রফেসারের কাছে আসিয়া তাহার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল

অমলা ॥ আমি যা করেছি—এ যুগে তা কিছু অন্যায় হয় নি। যুগটাই এখন এই। যা করেছি, শুধু ভালভাবে বাঁচবার জন্য।

পবিত্র ॥ বাঁচাই যায় এতে। ভালভাবেই বাঁচা যায় এতে। বেশ তোমরাই বাঁচো, কিন্তু আমি এতে বাঁচবো না অমলা। তুমি বলছো বাঁচবো, কিন্তু আমি দেখছি, আমরা মরে গেছি। সমাজটাই মরে গেছে। পচে গেছে।

কৃষ্ণার প্রবেশ

কৃষ্ণা ॥ খাবার যে সব জুড়িয়ে গেল।

পবিত্র ॥ ও পচে গেছে—ও খাবার আমার মুখে উঠবে না। আমি চলে যাচ্ছি। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন

কৃষ্ণা ॥ এ কী বাবা? তুমি কোথায় যাচ্ছো?

পবিত্র ॥ ভয় নেই। মরতে যাচ্ছি না। তোমরা যে নাগপাশে আমায় বেঁধেছো—সাধ্য কি আমার তা কেটে বেরিয়ে পড়ি। যাচ্ছি আমি পার্কে। একটা বেঞ্চে শুয়ে আকাশের তারাগুলো চেয়ে দেখবো আজ সারারাত। চেয়ে চেয়ে ভাববো, ওরা কত কি দেখছে, আমরা কত কি দেখছি।

প্রস্থানোদ্যত

কৃষ্ণা ॥ বাবা। দাঁড়াও, আমি আসছি। আমিও আজ ক'দিন থেকে কম

দেখছি না। আমি বুঝতে পেরেছি কি তোমার দুঃখ। কিন্তু মা, তাই বলে তোমাকেও আমি ভুল বুঝছি না। সাধারণে যা করে তুমি তাই করেছ। কিন্তু আমার বাবা অসাধারণ—অসাধারণ।

পিতার অনুগমন

অমলা॥ কিন্তু আমার কি দোষ। ঐ অসাধারণ লোকটাকে ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে আর আমার কী পথ আছে ?

অমলা কাঁদিতে লাগিল

যবনিকা

ভগ্নদূত
২৯ বর্ষ : ৪৩ সংখ্যা
১লা জুলাই, ১৯৫৫

সূর্যমুখী

কলিকাতার উপকণ্ঠে বিখ্যাত ধনী অশোক চৌধুরীর গৃহ। অশোক চৌধুরীর বয়স পঞ্চান্ন—বিপত্নীক, স্বাস্থ্যবান এবং সুদর্শন। তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তান কুনাল চৌধুরীর বয়স ছাব্বিশ। কুনাল সদ্য এম-এ পাশ করিয়াছে—কিন্তু ছাত্রজীবন হইতেই সোসিয়ালিষ্ট। কুনালের মাতার মৃত্যুর পর দুইটি প্রাণীর এই ছোট সংসারটি দেখাশোনা করার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া একজন তত্ত্বাবধায়িকাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে—বেতনভুক এই গৃহকর্ত্রীটির নাম সুপ্রিয়া রায—বয়স সাতাশ। কর্মকুশলতায় সুপ্রিয়া সকলেরই প্রিয় হইয়া নিজের নাম সার্থক করিয়াছে। সংসারে দাসদাসী প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকিলেও একমাত্র ভৃত্য কেষ্ট—বয়স কুড়ি—এই খাসমহলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

মাঘ মাসের অপরাহ্ণ। রবিবার। অশোক চৌধুরীর উপবেশন কক্ষে একটি বহিরাগত যুবকের সহিত কেষ্টর কথোপকথন হইতেছে

যুবক ॥ অশোক চৌধুরী শুনেছি বিরাট বড়লোক। বাড়িটাও দেখছি তাঁর বিরাট। কিন্তু এত বড বাড়িতে লোকজন তো তেমন দেখছি না।

কেষ্ট ॥ মার্জ্জনা করবেন—আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করতে আমি অক্ষম। আমি ভৃত্য, প্রভুর সাংসারিক বা পারিবারিক আলোচনায় যোগদান করা গৃহকর্ত্রীর আদেশ অনুসারে নিষিদ্ধ।

যুবক ॥ ওরে বাবা—তুমি—আপনি গ্র্যাজুয়েট?

কেষ্ট ॥ বিষয়টি ব্যক্তিগত—এ-রূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অভ্যস্ত নই।

যুবক ॥ ও। আমি সুপ্রিয়া রায়ের দর্শনপ্রার্থী।

কেষ্ট ॥ কার্ড ?...নেই। (ভিসিটার স্লিপ আনিয়া) লিখে দিন।

যুবক কার্ড লিখিয়া দিল। দর্শনের উদ্দেশ্য 'ব্যক্তিগত' তাহাও লিখিয়া দিল। অশোক চৌধুরীর প্রবেশ

অশোক ॥ (যুবককে দেখিয়া. কেষ্টর প্রতি) কে ?

কেষ্ট ভিসিটিং স্লিপখানি তাঁহার সম্মুখে ধরিল

অশোক ॥ (পাঠ কবিলেন) শ্রীসুকুমার রায়—সুপ্রিয়া রায়ের দর্শনপ্রার্থী। উদ্দেশ্য—'ব্যক্তিগত'। (ভিসিটিং স্লিপটি টেবিলে চাপা দিয়া রাখিয়া সুকুমারকে বলিলেন) বসুন।

কেষ্ট ভিতরে চলিয়া গেল। অশোক চৌধুরী ও সুকুমার মুখোমুখি হইয়া বসিল

অশোক ॥ আপনি সুপ্রিয়ার সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন ?

সুকুমার ॥ আমি তার ভাই। পারিবারিক কিছু কথাবার্তা আছে।

অশোক ॥ কিন্তু আপনাকে—তোমাকে তো এখানে এর আগে কখনো দেখিনি।

সুকুমার ॥ দিদি যে আপনার এখানে গৃহকর্ত্রীর কাজ নেন—এটা আমার ইচ্ছা ছিল না।• দিদি তখন বলেছিলেন—বেশ তো, তুমি এম-এ পাশ করো—চাকরী-বাকরী করো—আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসব। এদ্দিন এম-এ পাশ করতে পারিনি বলে আসিনি—এবার এম-এ পাশ করেছি, তাই দিদিকে ফিরিয়ে নিতে এলাম।

অশোক ॥ চাকরী-বাকরী কিছু পেয়েছ ?

সুকুমার ॥ এখনো পাইনি—সবে দোরে দোরে ঘোরা সুরু করেছি।

একটি গরম শাল-লইয়া কেষ্টর প্রবেশ

কেষ্ট ॥ (কর্তাকে) দিদিমণি দিলেন।

অশোক ॥ তোমার দিদিমণির ঐ এক ভয় আমার ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু ঠাণ্ডাটা কোথায়—যে লাগবে। ও…হ্যাঁ…ওহে কেষ্ট…তুমি যেন কী পাস দিয়েছ? (কাসিতে লাগিলেন।)

কেষ্ট ॥ আজ্ঞে বি-এ পাস করেছি।

অশোক ॥ (কেষ্টর প্রতি) ইনি এম-এ পাস—যাও।

কেষ্ট চলিয়া গেল

সুকুমার ॥ হ্যাঁ…তা'…চাকরীর আজকাল এইরকম বাজারই বটে।

অশোক ॥ তোমার দিদি আমার এখানে কী পোষ্টে আছেন জানো?

সুকুমার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ…গভর্নেস।

অশোক। গভর্নেস কী না জানি না…তবে গৃহকর্ত্রী বলতে পারো। কাগজে কী ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

সুকুমার ॥ আমার মনে আছে।…লক্ষপতি বিপত্নীক এবং তাঁহার একমাত্র তরুণ পুত্রের ছোট সংসার পরিচালনার জন্য একজন নির্ঝঞ্ঝাট গভর্নেস আবশ্যক। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী।

অশোক ॥ বাঃ। তুমি দেখি বিজ্ঞাপনটা মুখস্থ করে রেখেছ হে।

সুকুমার ॥ তার কারণ ছিল। বিজ্ঞাপনের প্রত্যেকটি কথা আমরা ওজন ক'রে দেখেছিলাম কী না। এই ধরুন—আপনি লক্ষপতি বিপত্নীক—এই শব্দ দুটোতেই আমাদের নানারকম সন্দেহ এসেছিল মনে।

অশোক ॥ সন্দেহ! কেন?

অশোক কাসিতে লাগিলেন

সুকুমার ॥ বিজ্ঞাপনদাতা একে লক্ষপতি—তায় বিপত্নীক। এদিকে দিদির

বয়েসটাও ছিল কম—আর সে অনুপাতে রূপটাও ছিল বেশী। সন্দেহটা কোথায় এবং কেন বুঝতেই পারছেন।

অশোক ॥ ও। তাই বুঝি তুমি আপত্তি করেছিলে।

সুকুমার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অশোক ॥ তবু দিদি এলেন। (কাসিতে লাগিলেন।)

সুকুমার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—এলেন। ইনটারভিউ দিয়ে এসে বললেন—'না, আমার ভাল লেগেছে। তা'ছাড়া, বেতনটাও বেশ।'

অশোক ॥ বেতনটা কত বলেছিলেন।

সুকুমার ॥ মাসে তিনশ'।

অশোক ॥ সেটা এখন কততে দাঁড়িয়েছে জানো ?

সুকুমার ॥ না। তবে বেড়েছে বুঝছি। তার কারণ, দিদি আগে আমাকে দুশ' পাঠাতেন—এখন পাঠাচ্ছেন তিনশ'।

অশোক ॥ এখন তোমার দিদির বেতন পাঁচশ'।

কেষ্টর একটি মাঙ্কি ক্যাপ ও মাফ্‌লার লইয়া প্রবেশ

কেষ্ট ॥ দিদিমণি দিলেন।

অশোক ॥ এই যা। আমি কেসেছি—শুনতে পেয়েছে।

অশোক কাসি চাপিতে গিয়া আবার কাসিয়া ফেলিলেন। মাঙ্কি ক্যাপটি পরিয়া মাফ্‌লারটি গলায় জড়াইলেন। কেষ্ট ভেতরে চলিয়া গেল

অশোক ॥ দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছ—তা তোমার দিদি যাবেন ?

সুকুমার ॥ টাকাটাই যদি সব হয়—তবে যাবেন না। কিন্তু তা' যদি না হয় কেন যাবেন না ?

অশোক ॥ না—না, টাকাটাই যে দুনিয়ায় সব এ-কথা আমি বলি না। মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি এ-সব জিনিস মানুষের জীবনে আছে।

টাকাতে এ-সব খানিকটা পুষ্ট হয় নিশ্চয়—কিন্তু টাকার অভাবে যে একেবারে মরে যায় তা' আমি বলব না। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কেষ্ট ছুটিয়া আসিল।) আমি বাগনে যাচ্ছি। (ভিসিটিং শ্লিপখানি কেষ্টর হাতে দিযা) তোমার দিদিমণিকে দাও (কেষ্ট শ্লিপ লইয়া ভিতরে চলিযা গেল।) you are quite an interesting young man ! পালিও না, আমি আসছি।

অশোক চৌধুরী বাহিরে চলিযা গেলেন। ভিতর হইতে কুনাল চৌধুরীর প্রবেশ। কুনাল সুকুমারকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। সুকুমারও কুনালকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

কুনাল ॥ সুকুমার! তুমি!

সুকুমার ॥ কুনাল! কী আশ্চর্য! তুমি এখানে?

কুনাল ॥ কেন, এই তো আমাদের বাড়ি।

সুকুমার ॥ তাই নাকি! এ তবে একটা আবিষ্কার দেখছি।

কুনাল ॥ ব'সো ব সো।

সুকুমার ॥ এবারকার এম-এর ইকনমিক্সের ফার্ষ্ট আর সেকেণ্ড প্লেশ হয় আমার নয় তোমার, সবাই বলতেন। তুমি ফার্ষ্ট হযেছ, অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কুনাল ॥ আমার কাছে হেরে গেছ ব'লে তোমার মনে দুঃখ নেই তো সুকুমার?

সুকুমার ॥ না—না তা' কেন? You thoroughly deserve your success, তা' হলে এই তোমাদের বাড়ি—আর তুমি তোমার যে-প্রিযার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখে লিখে আমাদের প'ড়ে শোনাতে—তোমার সেই প্রিয়াও তবে এই পাড়াতেই থাকেন।···হ্যাঁ তা'ই তো বলেছিলে···মনে পড়ছে।

কুনাল ॥ পাড়াতে ব'লছ কী,—এই বাড়িতেই থাকেন। তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই—হঠাৎ এ বাড়িতে তোমার পায়ের ধুলো পড়ল যে। এখন করছ কি?

সুকুমার ॥ বেকার।

কুনাল ॥ ও। তাই বুঝি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। How funny! ···এটা না জেনে আমি তাঁরই ছেলে।

কেষ্ট একখানি গরম শাল আনিয়া কুনালের সম্মুখে ধরিল।

কুনাল ॥ না—না। শাল কেন?

কেষ্ট ॥ দিদিমণি বললেন—আপনার ভারি সর্দি হযেছে।

কুনাল ॥ সর্দি হয়েছে। (নাক ঝাড়িযা) হ্যাঁ তাই তো। এই সেরেছে --আজ তবে—

কেষ্ট ॥ চানের আগে আপনার বুকে গরম তেল মালিশের হুকুম হযেছে।

কেষ্ট অন্দরে চলিয়া গেল।

কুনাল ॥ এই বাড়িতেই যে তিনি—এখন তা' বুঝছ?

সুকুমার ॥ হুঁ। এরপরেই আবার কী হনুমানটুপি আর মাফলার আসবে?

কুনাল ॥ (সস্মিতভাবে) হ্যাঁ—তা' আসে। আসবে। বুঝলে হে, এতেই গভীরতাটা মাপা যায়।

সুকুমার ॥ গভীরতাটা কি তবে তোমরা দুজনেই মাপছ?

কুনাল ॥ দুজনেই মানে?

সুকুমার ॥ (অশোক চৌধুরীর কথা বলিতে গিয়া থামিযা গেল। বিষয়টা অন্যদিকে লইল।) দুজনে মানে পরস্পর—

কুনাল ॥ সে-সব ভাই অনেক কথা। একবার যখন ভাই তোমাকে বাড়িতে পেয়েছি—আজ কিন্তু ছাড়ছি না। রাত্রে এখানে কিন্তু খেতে হবে। বিকেলে তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের বস্তি-উন্নয়ন কাজ দেখাতে।

সুকুমার ॥ তুমি তা'হলে এখন হাতে-কলমে ষোল আনা সোসালিষ্ট ব'নে গেছ কুনাল?

কুনাল ॥ হ্যাঁ। ভাবের ঘরে আমার লুকোচুরি নেই। আর এই নিয়েই বাবার সঙ্গে আমার বেঁধেছে বিরোধ। যে-বস্তিটায় আমি প্রথম হাত দিয়েছি, সে-বস্তিটার Landlord ছিলেন আমার বাবা। 'স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত'—আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন ব'লে বাবা নোটিশ দিয়েছেন। (হনুমান টুপি এবং মাফলার লইয়া কেষ্টর প্রবেশ) না—না। আমি বাইরে যাচ্ছি না। কিন্তু যা শীত পড়েছে তা'তে এ-গুলো দরকার বটে। গিয়ে বলো আমি রাখলাম। (কেষ্ট চলিয়া যাইতেছিল) আর শোনো—ইনি আমার সঙ্গে আজ রাতে খাবেন। ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি এখন আমার ঘরে। কেউ যেন না বিরক্ত করে। (কেষ্ট ভিতরে চলিযা গেল) এ-সব আমার জন্য নিজহাতে বুনেছে।

সুকুমার ॥ তোমার বাবাকেও তো এসব পরতে দেখলাম—সেগুলি বুঝি কেনা ?

কুনাল ॥ আমার তাই মনে হয়। এসো না, সব বলছি।

তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। অন্য দ্বার-পথে সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল। স্পষ্ট বোঝা গেল সুপ্রিয়া নেপথ্য হইতে সুকুমার এবং কুনালের সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছে। সুপ্রিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। কী করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমন সময় বাহিরের দ্বার-পথে অশোক চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

অশোক ॥ মালী, তোমায় আমি এই শেষবার বলে দিচ্ছি—আর একটি সূর্যমুখীর গাছ যদি মরে তবে তুমিও মারা গেছ।

অশোক চৌধুরী একগুচ্ছ সূর্যমুখী হস্তে প্রবেশ করিলেন।

অশোক ॥ এই যে সুপ্রিয়া, এই নাও তোমার সেই সূর্যমুখী—যেমনটি আশা করেছিলাম তা' হয়নি অবশ্য।

সুপ্রিয়া ॥ কেন এ তো বেশ হ'য়েছে।

অশোক ॥ না, হয়নি। মালীটা কেবল ফাঁকি দিচ্ছে। আমার আশা ছিল—

সুপ্রিয়া ॥ কার আশা কবে পূর্ণ হয় বলুন।

অশোক ॥ ও, হ্যাঁ তা'ও তো বটে। ভাল কথা সুকুমার রায় বলে একটি ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—তোমার ভাই?

সুপ্রিয়া ॥ হ্যা।

অশোক ॥ তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে?

সুপ্রিয়া ॥ হ্যা, সেইরকমই কথা ছিল। ওকে পড়াবার জন্যেই আমি চাকরী নিয়েছিলাম। আমাদের ছোট কর্তার সঙ্গে এবার এম-এ পাস করেছে। ছোট কর্তা ফাষ্ট হয়েছেন—ও হয়েছে সেকেণ্ড। আমি চাকরি করি এটা ও সইতে পারেনা। আমি বলেছিলাম, বেশ তো, তুমি এম-এটা পাস করো, তারপর না হয় চাকরী ছেড়ে দেব।

অশোক ॥ তোমার জীবনের এই কয়েকটা পাতা আমায় পড়তে দাওনি সুপ্রিয়া। কেন বলো তো?

সুপ্রিয়া ॥ আমার জীবনের এসব খুঁটিনাটি আপনার জেনে লাভ? তা, ছাড়া আমার অভাব-অনটনের কথা আপনাকে জানানো মানেই আপনার কাছে আরো ছোট হওয়া। চাকরী ক'রে যতটা ছোট হ'য়ে আছি তার চেয়েও ছোট হওয়া।

অশোক ॥ আমি জানি—আমি বুঝি—চাকরী করবার মেয়ে তুমি নও।

সুপ্রিয়া ॥ আপনি আমায় বাঁচালেন। (হাত জোড় করিয়া) এবার তবে আমায় ছেড়ে দিন।

অশোক ॥ আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার স্ত্রী যখন মারা গেলেন —আমি চোখে আঁধার দেখলাম। সংসারে দ্বিতীয় লোক নেই। আমার বিরাট ব্যবসা নিয়ে আমি তখন হাবুডুবু খাচ্ছি। একটি মাত্র ছেলে—আদুরে গোপাল—একগেলাস জল গড়িয়ে খেতে জানেনা—

রাতদিন পড়াশোনা আর সমাজ-সেবা নিয়ে হৈ হৈ করছে। দেখা-শোনার কেউ নেই, না তাকে, না আমাকে—সংসারটা নয়ছয় হ'য়ে যাচ্ছিল—অসহায়ভাবে দেখছিলাম—আর ভাবছিলাম কী করি—

সুপ্রিয়া ॥ এ-বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বাংলা দেশে সুপাত্রীর কী কোনো অভাব ছিল কিছু ?

অশোক ॥ কিছুমাত্র না। কিন্তু বাধা ছিল।

সুপ্রিয়া ॥ কিসের বাধা ?

অশোক ॥ বাধা ছিল—ঐ ছেলে। ছেলে মনে আঘাত পাবে এই ছিল বাধা। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম আমাদের দেখাশোনার জন্যে ভালো মাইনে দিয়ে গৃহকর্ত্রী করে কাউকে রাখব। পেলাম তোমায়। শ্মশানে নাকি ফুল ফোটেনা। ফুটলো তো।

সুপ্রিয়া ॥ আপনার এইসব কবিত্ব আর উচ্ছ্বাস একবার সুরু হ'লে আমি বড ভয় পাই। আমি এখন চলি।

অশোক ॥ চলি মানে ? সত্যি সত্যিই কি তুমি চ'লে যাচ্ছো ?

সুপ্রিয়া ॥ কোথায় ?

অশোক ॥ আমার এ-ঘর সংসার ছেড়ে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ?

সুপ্রিয়া ॥ ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি এখনো।

অশোক ॥ দেখা হয়নি ! সে কোথায় ?

সুপ্রিয়া ॥ ছোট কর্তা তাকে টেনে নিয়ে গেছেন তাঁর ঘরে।

অশোক ॥ তোমার ভাইও সোসালিষ্ট না কি ?

সুপ্রিয়া ॥ সোসালিষ্ট কি কমিউনিষ্ট তা' আমি জানি না, তবে ভারী মরালিষ্ট।...ওকে আমিও ভয় পাই। এ-বাড়ির পরিবেশটি ও বেশ ভাল করে দেখবে—দেখে ও যদি বোঝে এখানে আমি নিরাপদ নই—আমাকে ছাড়বে না, টেনে নিয়ে যাবে এখান থেকে। তা'তে ওর নিজের লাভ-ক্ষতি তলিয়ে দেখবে না—তিনশ' টাকা মাসহারা কাটা যাবে, তাও একটিবার ভাববে না।

অশোক ॥ আজকালকার ছেলেরা বড় dangerous। স্বচক্ষেই তো দেখছি, আমার ঐ ছেলে গাছের যে-ডালে ব'সে আছে সেই ডালই কাটছে। তিলজলায় আমার অত বড় বস্তিটা কুনালের নামে কিনেছিলাম—মাসে পাঁচটি হাজার টাকা আয় ছিল ঐ এক বস্তি থেকে—

সুপ্রিয়া ॥ আমি জানি। সে বস্তির মোটা আয়টা একটা বস্তি-উন্নয়ন সমিতি ক'রে তাদের লিখেপড়ে দিয়েছেন ছোটকর্তা।

অশোক ॥ আমার রক্ত-জল-করা টাকা উনি খোলাম কুচির মতন বিলিয়ে দিচ্ছেন সমাজ সেবার নামে। বে-আক্কেল! আর আমি ওকে একটি পয়সাও দিচ্ছিনা। আমি ভাবছি—আমি ভাবছি—

সুপ্রিয়া ॥ কী ভাবছেন ?

অশোক ॥ আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব। ওরই মুখ চেয়ে, সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া, আর আমি বিয়ে করিনি। আজ মনে হচ্ছে কী ভুল আমি করেছি!

সুপ্রিয়া ॥ আপনার উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনা দেখে আমি বড ভয় পাই। (হাতঘড়ি দেখিয়া) এই দেখুন আপনার ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেছে—চলুন—

সূর্যমুখীর গুচ্ছটি হাতে নিয়া অশোক চৌধুরীকে লইয়া অন্দরে যাইতেছিল এমন সময় কুনাল এবং সুকুমার উচ্চহাস্যরোলের মধ্যে কক্ষে প্রবেশ করিল

কুনাল ॥ (তাহার পিতাকে দেখিয়াই যেন ভূত দেখিল এই ভাবে) ও—(সে আবার তখনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল)

সুকুমার ॥ দিদি!

অশোক চৌধুরী এবং সুপ্রিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

সুপ্রিয়া ॥ (অশোক চৌধুরীকে) আজ কতদিন পর ভাইটির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, আমি দুটো কথা বলে আসছি।

অশোক ॥ (সুকুমারের প্রতি) সুকুমার তুমি মরালিষ্ট শুনে খুসী হযেছি—পালিযোনা, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব।

অশোক চৌধুরীর অন্দরে প্রস্থান

সুকুমার ॥ কখন এসেছি, তোমার দেখা নেই।

সুপ্রিযা ॥ আমার সে অভিযোগ নেই। আড়াল থেকে তোমাকে দেখেছি—তোমাদের কথাও সব শুনেছি।

সুকুমার ॥ বাঁচিযেছ। তবে তো দেখছি নতুন করে আর বলবার কিছু নেই। আমরা—আমরা কখন রওনা হচ্ছি ?

সুপ্রিয়া ॥ কিন্তু আমি যাব কেন বল্।

সুকুমার ॥ যাবেই বা না কেন ?

সুপ্রিয়া ॥ তুই এম-এ পাস করেছিস। নিজের পাযে দাড়াতে পারবি। কিন্তু আমিই বা নিজের পাযে দাঁড়াব না কেন ?

সুকুমার ॥ এ-রকমতো কোনো কথা ছিল না দিদি। কথা ছিল আমি এম-এ পাশ করলেই তোমার কাজ শেষ হ'লো। ছিল কি না ?

সুপ্রিযা ॥ ছিল। সে-কথা হ'যেছিল তখন যখন নিজেকে আমি জানতাম না।···তখন—যখন আমার নিজের কতটা শক্তি আমি খবর রাখ-তাম না। কিন্তু চাকরা করতে এসে আমি যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। যখন দেখছি নিজের কিছুটা ক্ষমতা আছে তখন আমিই বা কেন অক্ষম হ'যে ব'সে থাকব—তোর গলগ্রহ হযে ?

সুকুমার ॥ চমৎকার! দশ-পনের বছর আগে এ-সব কথা কোন ভাই শুনলে মনে ব্যথা পেত কিন্তু আজ এ কথা শুনে আমার আনন্দই হচ্ছে দিদি। চাকরী করতে এসে কতটা দক্ষতা তুমি দেখিয়েছ সে আমি জানি না কিন্তু এ বাড়ির লোকদের যে তুমি বশ করেছ সে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি। আমি জানতাম আমার দিদির রূপ আছে কিন্তু এবার তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে একটি আধুনিক

পরিবারের কষ্টিপাথরে তুমি পরখ হয়ে বাস করেছ। আর তা যখন হ'য়েছে এই আশাই আমি রাখব দিদি, নিজের মূল্য নিরূপণে তুমি ঠকবে না—কি বলো ?

সুপ্রিয়া ॥ তুই মিথ্যে বলিস নি—আমারও মনে হয় আমি ঠকব না। আজকাল মানুষের জীবন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একটা হিসাব। সংসার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেনা-পাওনার হাটবাজার। এই দু'বছরে এখানে চাকরী ক'রে নাগরিক সভ্যতার যে রূপটা আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে এই নগ্ন সত্যটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে ত্যাগের চেয়ে ভোগ বড়। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ, দয়া-মায়া-মমতা নেই তা বলব না, আছে, কিন্তু সেটা নিষ্কাম নয়। কিন্তু সে যাক, তুই যখন ছোট কর্তার বন্ধু আর ছোট কর্তা যখন তোকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে তখন তোকে লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে বসিয়ে দিতে পারি। এ লাইব্রেরির একটি বিশেষত্ব আছে—এর প্রায় পনের আনা বই হয় ধনতন্ত্র নয় সমাজতন্ত্র নিয়ে।

সুকুমার ॥ তার মানে একখানা ধনতন্ত্রের বই বড় কর্তা কিনলে ছোটকর্তা দু'খানা সমাজতন্ত্রের বই কিনবেন, এই তো ?

সুপ্রিয়া ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ। আমার তো মনে হয় যে-রেটে এ-সব বই বেড়ে চলেছে তাতে আলমারিতে আলমারিতেই ঠোকাঠুকি লাগবে কোনদিন।

কুনাল চৌধুরীর প্রবেশ। তাহার হাতে socialism এর নতুন একখানি ভারি বই

কুনাল ॥ কি তোমাদের এত সব গল্প হচ্ছে—আমাকে বাদ দিয়ে ?

সুকুমার ॥ বাদ যাবে কেন ভাই ?...এসো। ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র আলোচনা হচ্ছিল আমাদের।

কুনাল ॥ তা' যদি বলো ভাই তবে এ আলোচনার শেষ কথাটি পাবে এ-বইয়ে। আজ ডেলিভারী পেয়েছি। (বইখানি সুকুমারের হাতে

দিয়া) নাও, ঐ লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসো। আমি তোমার দিদির সঙ্গে দুটো জরুরী কথা ব'লে আসছি।

সুকুমার ॥ শুধ এ-কথাটা মনে রেখো আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।

হাসিয়া লাইব্রেরী ঘরের দিকে প্রস্থান

কুনাল ॥ এই শোনো, তোমার ভাইকে আমি সব বলে ফেলেছি। আমার সঙ্গে তোমার বিয়েতে তার আপত্তি নেই। আর তবে দেরী নয়—চলো আজই ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে নোটিশটা দিয়ে আসি।

সুপ্রিয়া ॥ ধীরে ছোটকর্তা—ধীরে। আপনি কী জানেন যে আপনার বাবা আপনাকে ত্যাজ্যপুত্র করবার নোটিশ দিয়েছেন।···জানেন আপনি ?

কুনাল ॥ হ্যাঁ, কথাটা কানাঘুসা শুনছি বটে—তাঁর নিজের মুখে কিছু শুনিনি। তোমাকে কিছু বলেছেন নাকি ?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ, আজই বলেছেন।

কুনাল ॥ আমি সোসালিষ্ট—বোধ হয় এ-জন্য নয়। তাঁর বস্তিটাতেই আমি আমার কাজ প্রথম সুরু করেছি—এই রাগে বোধ হয় ?

সুপ্রিয়া ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ, তাই। তিনি তোমার সোসালিষ্ট বুলিতে এদ্দিন ভয় পাননি। হাতেনাতে যেই কাজ সুরু করেছ—সেটা গিয়ে বিঁধেছে ওঁর বুকে গুলির মতো। আর কেনই বা তা' বিঁধবে না ? ওঁর রক্ত-জল-করা সম্পত্তি—সেটা খোলামকুচীর মতো তুমি দশজনের মধ্যে বিলিয়ে দেবে তা' ওঁর সইবার কথা নয়।

কুনাল ॥ তুমি সইতে পারছ তো ?

সুপ্রিয়া ॥ না—আমিও পাচ্ছি না। নিজের উপার্জিত সম্পত্তি যদি তুমি বিলিয়ে দিতে তবে আমি তোমায় শ্রদ্ধায় নমস্কার করতাম। কিন্তু পরের সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে তোমার পৌরুষটা কোথায় ?

কুনাল ॥ অন্যায় শোষণ আর উৎপীড়ন ক'রে যে-সম্পত্তি বাবা জমিয়েছেন সেই বে-জম্মা-সম্পত্তি আমি ধ্বংস করব। একে তুমি পৌরুষ না বলতে

চাও ব'লো না—কিন্তু পৌরুষ বলতে তুমি কী বোঝো—তবে সেটা আমায় বলো।

সুপ্রিয়া॥ পৌরুষের আদর্শ আমার কাছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—একটি পয়সা অন্যায়ভাবে উপার্জন করেননি। কিন্তু ভোগও করেছিলেন চরম, দানও করেছিলেন চরম।···ভারতের আদর্শ বলতে আমি এইটাই বুঝি কুনাল। আমার নিজের কথা যদি বলো আমি ভোগও করতে চাই ত্যাগও করতে চাই। কিন্তু সেটা নিজের উপার্জনে।

কুনাল॥ তাই ক'রো। কিন্তু, এতে, তোমাতে আমার বিয়েতে বাধা কি ?

সুপ্রিয়া॥ বিয়ে করতে চাও কোন্ মুখে ? একটি পয়সা আজও তুমি রোজগার করোনি কুনাল !

কুনাল॥ ও, তাই না কী !

কেষ্টর প্রবেশ। তাহার হাতে Socialism এর সেই বৃহদাকার বইখানি।

কেষ্ট॥ বাবুটি বললেন, বইখানি তিনি যত পড়ছেন তত তাঁর খিদে পাচ্ছে। বইটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে বললেন।

কুনাল॥ চলো, আমি যাচ্ছি। হ্যাঁরে কেষ্ট, তুই তো বি. এ—পাস করেছিস, কত না তোর বেতন ?

কেষ্ট॥ ষাট। দিন গেলে দু-টি টাকা ছোটকর্তা।

কুনাল॥ এম. এ পাস দিলে কত বেতন হ'ত তোর ?

কেষ্ট॥ সর্বনাশ ! চাকরীই হ'ত না।

কুনাল॥ চাকরীই হ'ত না ! কেন ?

কেষ্ট॥ আমাদের কর্তাই যে এম. এ পাস ন'ন।

বলিয়াই কেষ্ট পালাইয়া গেল

কুনাল॥ তোমার ভাই, আজ তোমাকে নিতে এসেছে—চলে যাবে না কী তুমি ?

সুপ্রিয়া॥ হ্যাঁ, যাবো।

কুনাল ॥ এই পাঁচশ' টাকার চাকরী ছেড়ে ?

সুপ্রিয়া ॥ তোমরা বলো চাকরী—কিন্তু আমি তা' মনে করিনা। চাকরীর বাজার তো দেখছি, বি. এ, এম. এ পাস করে আশি বা একশ'। তা' সে-চাকরীও সবার জোটে কই ? আমি মাত্র ম্যাট্রিক পাস —রোজগার করছি মাসে—পাঁচশ', এটা চাকরি নয়, তোমাদের এখানে রক্ষিতা হয়ে বাস করছি—এটা তার মাসোহারা। যখনই কথাটা ভাবি তখনই আমার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে কুনাল। কিন্তু সবকিছু সয়েছিলাম এদ্দিন—আমার ঐ ভাইটার জন্য—ওকে মানুষ করবার জন্য। কিন্তু আর নয়। এ চাকরী আমি ছেড়ে দিচ্ছি—আজই ছেড়ে দিচ্ছি।

কুনাল ॥ কিন্তু তারপর ?

সুপ্রিয়া ॥ বিয়ের চেষ্টা দেখব। বিয়ে না হয়, চাকরীর চেষ্টা দেখব।

কুনাল ॥ আমি তো বিয়ের কথাই বলছি সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ॥ বিয়ের উপযুক্ত পাত্র তুমি নও। একটি পয়সা তোমার রোজগার নেই। প্রেমের বাজারে তুমি মহাজন। কিন্তু বরের বাজারে তুমি দেউলিয়া। তোমার প্রেমে আমি পড়েছি সত্য কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে পারিনা আমি কুনাল। এখনকার মেয়েরা বিয়ে করতে গিয়ে আগে দেখবে সিকিউরিটি—তোমার কাছে সেটা আমি কিছুমাত্র আশা করতে পারিনা কুনাল।

অশোক চৌধুরীর কাশি শোনা গেল।

কুনাল ॥ তোমার নগ্ন মূর্তিটা আজ আমি দেখলাম সুপ্রিয়া। মনে হচ্ছে আরো বেশী করে তোমার প্রেমে পড়লাম। প্রেমের বাঁধনে ধরা যদি না পড়ো, স্নেহের বাঁধনও রয়েছে, বাবার। দেখি তুমি কি করে পালাও। কিন্তু আমাকে পালাতে হচ্ছে, বাবা আসছেন !

কক্ষান্তরে কুনালের পলায়ন। অশোক চৌধুরীর প্রবেশ।

অশোক ॥ কে গেল ?

সুপ্রিয়া ॥ ছোটকর্তা।

অশোক ॥ আজ কদিন আমাকে এড়িয়ে চলছে—পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে যে ত্যাজ্যপুত্র করব, একথাটা নিজমুখে শোনাতে পারিনি এখনো আমি।

সুপ্রিয়া ॥ কথাটা ছোটকর্তা শুনেছেন—আর সেটা বিশ্বাসও করেছেন, কাজেই আপনার ভয় নেই। নিজমুখে না বললেও আপনি যা' চাইছেন তা' হবে। ছোটকর্তা হয়তো আমার সঙ্গেই যাবেন।

অশোক ॥ তার মানে তুমি সত্যি সত্যিই যাচ্ছো ?

সুপ্রিয়া ॥ আপনাকে তো আমি সব বলেছি।

অশোক ॥ তোমার ভাই তোমাকে যেতে বলেছে ? এখানকার পরিবেশটা নোংরা বলেছে ?

সুপ্রিয়া ॥ না, তা অবশ্য বলেনি।

অশোক ॥ ছেলে আমার সোসালিষ্ট বনেছে, এই যা, নইলে ওর আর কোনো দোষ নেই। বরং আমি বলব he is too good. আর আমি আমার নিজের সম্বন্ধে জোর গলায় বলতে পারি, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, কিন্তু তার দায়িত্ব নিতেও প্রস্তুত আছি। আকারে ইঙ্গিতে একথা এর আগেও তোমাকে অনেকবার বলেছি। অবশ্য তেমন কোনো সাড়া পাইনি। কিন্তু আজ এসে গেছে, যাকে বলে কি না একটা চরম মুহূর্ত। আজ আর তুমি চুপ ক'রে থেকোনা সুপ্রিয়া—উত্তর দাও সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ॥ আপনি আমাকে বিয়ে করতে চা'ন ?

অশোক ॥ চলো, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে আজই নোটিশ দিয়ে আসি—

সুপ্রিয়া ॥ একটু দাঁড়ান। আপনার চাকরী আর করবনা ঠিক করেছি। চাকরী ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করতেই ইচ্ছে—

অশোক ॥ আমার মনের কথাটি তুমি বলছো সুপ্রিয়া। আমি তোমার কোনো অভাব রাখব না সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ॥ আমি জানি! টাকাপয়সার অভাব একেবারেই হবে না আমার —আর টাকা দিযে যা কেনা যায়, সবই পাব আমি। মেয়েরা এই সিকিউরিটিই চায় আজকাল।

কেষ্টর প্রবেশ

অশোক ॥ (ক্রোধে) কী? এখানে কেন?

কেষ্ট ॥ (থতমত খাইয়া) কী জানি কেন।

অশোক ॥ Get out (কেষ্ট পলাইতেছিল) শোনো

কেষ্ট ॥ এঁ্যা!

অশোক ॥ ড্রাইভারকে বলো—এখুনি গাড়ী বের করতে।

কেষ্ট ॥ ছোটকর্তারও সেই হুকুম—তাই না আমি যাচ্ছিলাম।—আমার দোষটা কোথায—যে আপনি আমাকে এরকম করে Get out করলেন?

অশোক ॥ ও, হঁ্যা, তুমি তো আবার গিযে Graduate. Excuse me কেষ্টধন। আশি থেকে একশ'—তোমার সেই আর্জি, আজ মঞ্জুর। যাও, ড্রাইভারকে গিয়ে বলো, এখুনি আমার গাড়ী চাই।

কেষ্ট ছুটিয়া আদেশ পালন করিতে গেল

সুপ্রিয়া ॥ ছোটকর্তা গাড়ীটা চেয়েছিল—কী এমন জরুরী কাজ যে আপনি দিলেন না?

অশোক ॥ নিজের গাড়ী বস্তি-উন্নযনের কাজে দান করেছেন ছোটকর্তা—এখন আমারটা নিয়ে টানাটানি।

সুপ্রিয়া ॥ কোথায় যাচ্ছেন?

অশোক ॥ কেন, তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি—ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের আপিসে।

সুপ্রিয়া ॥ তা' এতো তাড়া কেন?

অশোক ॥ আমার শুধু ভয়—আবার তোমার কখন কি মত হয়। তাই শুভস্য শীঘ্রম।

সুপ্রিয়া ॥ আপনি আমাকে সত্যিই সাংঘাতিক ভালবেসে ফেলেছেন, দেখছি।

অশোক ॥ (হাসিয়া) বিয়েতে যখন তোমার মত হয়েছে, তখন একথা আমি জোর করে বলতে পারি, যে এ ভালবাসাটা উভয়তঃ—নয় কি সুপ্রি : ?

সুপ্রিয়া ॥ এ প্রশ্ন আমাকে করবেন না আপনি।

অশোক ॥ কেন ? কেন সুপ্রিয়া ?

সুপ্রিয়া ॥ উত্তর দিতে আমার বড় লজ্জা হচ্ছে মিষ্টার চৌধুরী—ও থাক। আপনার বয়েস পঞ্চান্ন—আমার বয়েস সাতাশ, মনে রাখবেন কিন্তু।

অশোক ॥ কেন ? কেন সুপ্রিয়া ?

সুপ্রিয়া ॥ রেজিষ্ট্রি অপিসে জিজ্ঞেস করবে যে।

অশোক ॥ তোমার মনের কথাটা আমি এতক্ষণে ধরতে পাচ্ছি সুপ্রিয়া। তুমি বলতে চাও পঞ্চান্ন বছরের লোক সাতাশ বছরের মেয়েকে ভাল-বাসতে পারলেও সাতাশ বছরের মেয়ে পঞ্চান্ন বছরের লোককে ভাল-বাসতে পারে না—কেমন এই তো ?

সুপ্রিয়া ॥ না—না, তা কেন ? আমার বাবাকে আমি কম ভালবাসিনা মিষ্টার চৌধুরী।

কেষ্টর প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে মোটরের হর্ণ শোনা গেল

কেষ্ট ॥ গাড়ী রেডী স্যার।

অশোক ॥ ছোটকর্তাকে গিয়ে বলো—তার জন্য গাড়ী রেডী। (আদেশ পালন করিতে কেষ্টর প্রস্থান) তোমাকে ধন্যবাদ—বিষয়টা ভেবে দেখব আমি !

অশোক চৌধুরীর কক্ষান্তরে প্রস্থান। সুপ্রিয়া মুহূর্তকাল কী ভাবিল। কুনাল ও সুকুমারের উচ্চহাস্য শোনা গেল। সুপ্রিয়া ত্বরিতপদে বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। ইহার একটু পরেই কেষ্ট ছুটিয়া আসিয়া চারিদিক দেখিয়া লইয়া চাপা গলায় কুনালের উদ্দেশ্যে বলিল—

কেষ্ট ॥ এখানে এখন কেউ নেই ছোটকর্তা।

কুনাল ও সুকুমারের প্রবেশ

কুনাল ॥ (সুকুমারকে) সত্যি দেখছি, কেউ নেই। বাঁচা গেল। চলো ভাই, বেরিয়ে পড়ি।

সুকুমার ॥ আবার বলছি এ তোমার ভাবী অন্যায় হচ্ছে কুনাল—আমাকে ডিনারের নেমন্তন্ন করে নিজে বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছো! এটা কী ভদ্রতা হচ্ছে ভাই?

কুনাল ॥ বললাম তো, বস্তিতে চলো, ডিনার খাওয়াচ্ছি আমি—আর এখানে খেতে চাও, আমার প্রিয়া খাওযাবেন এখন। (হো হো করিয়া হাসিযা উঠিল) আমি বলি গাছেরও খেযো, তলারও কুড়িয়ো—(জোব হর্ণ শোনা গেল) আঃ। যাচ্ছি। চলো।

সুকুমারকে একপ্রকার জোর করিয়া টানিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল

কেষ্ট ॥ (আপন মনে) Get out! Get out! ঘাটের মড়া—আমাকে কিনা বলে Get out!

অশোক চৌধুরীর পুনঃ প্রবেশ

অশোক ॥ এই বাসকেল, এতো হর্ণ দিচ্ছে যে গাডী?

কেষ্ট ॥ ছোটকর্তাব কাণ্ড। আমি কী বলব স্যার?

সুকুমারের পুনঃপ্রবেশ—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলিয়া যাওয়ারও শব্দ শোনা গেল

অশোক ॥ আরে, এসো এসো মিষ্টার,—কী যেন তোমার নাম?

সুকুমার ॥ মিষ্টার নয—শ্রীসুকুমার বায়। আপনি আমার সঙ্গে কি আলাপ কর্তে চেয়েছিলেন।

অশোক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো—বোসো। তোমার দিদিকেও ডাকছি। ওরে কেষ্টা, যা তো দিদিমণিকে গিয়ে বল—

কেষ্ট ॥ যাচ্ছি।

অন্দরের দিকে প্রস্থানোদ্যত

সুকুমার ॥ না, না, তিনি ভেতরে নেই। আমরা গিয়ে দেখি গাড়ীতে বসে রয়েছেন।

অশোক ॥ তা' গাড়ী তো চলে গেল!

সুকুমার ॥ হ্যাঁ, ঐ গাড়ীতেই তিনিও চলে গেলেন।

অশোক ॥ কোথায়—কোথায় গেলেন?

সুকুমার ॥ গেলেন—আপনার ত্যাজ্যপুত্র ছোটকর্তার সঙ্গে!

অশোক ॥ মানে?

সুকুমার ॥ প্রথমে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের আপিসে—বিয়ের নোটিশ দিয়ে, তার-পর একেবারে বস্তিতে, মানে ওখানেই পাকাপাকি ভাবে ঘর বাঁধতে।

অশোক ॥ (কেষ্টকে) এই রাসকেল, ফ্যানটা খুলে দে।

কেষ্ট ॥ এই শীতে? আপনার যে ঠাণ্ডা লাগবে স্যার!

অশোক ॥ আচ্ছা, থাক। কিন্তু লাইটগুলো জ্বালতে হবে না—এই অন্ধকারে?

কেষ্ট পটাপট সুইচগুলি অন করিতে লাগিল। একে একে সমস্ত আলোগুলি জ্বলিয়া অন্ধকার ঘুচাইল

—যবনিকা—

স্বদেশ

নববর্ষ ও পৌষালী সংখ্যা

১৯৫৬

বলো হরি হরি বোল

মাণিকতলার বস্তি অঞ্চলে বড়রাস্তার ধারে অতি ছোট একটি চায়ের দোকান। তা' যতো ছোটোই হ'ক সাইনবোর্ড একটি আছে। তাতে দোকানের নাম লেখা :-"চাতালের বৈঠক।" খান দুই লম্বা বেঞ্চি। আর তারই সামনে কেরোসিন কাঠের লম্বা টেবিল। টেবিলের ওপর অয়েল ক্লথের আচ্ছাদন। ঘরটির পেছন দিকে ঘেরা একটুকু জায়গা, সেখানে চা, চপ, কাট্‌লেট প্রভৃতি তৈরি হয়। .'চাতালের বৈঠকে'র মালিক চৈতন্য চরণ দাস। দোকানের দুটি বয় আছে। একজনের নাম সুখ আরেকজনের নাম শান্তি। চায়ের দোকানের টেবিলে একটি বাংলা খবরের কাগজ থাকে। খদ্দেরদের কাছে ইহাও একটি আকর্ষণ। চায়ের দোকানটিতে আরেকটিতে হাতে লেখা বিজ্ঞাপনও টাঙানো রয়েছে। তাতে লেখা :—'শ্মশান বন্ধু সমিতি'। চৈতন্য বাবু হিসাব লিখছেন। অপরাহ্ন। এখন পর্যন্ত কোন খদ্দের নেই।

দোকানের ঘেরা-অংশ থেকে চৈতন্য দাসের স্ত্রী শিবানীর গলা শোনা গেল

শিবানী॥ কোনো মতে দশখানা চপ হ'ল। টোস্টের পাঁউরুটি কেটে রাখলাম। আর যা করবার সুখ শান্তিই ক'রবে। খদ্দের তো এখনো কেউ আসেনি মনে হ'চ্ছে। আমি এবার কেটে পড়ি। আস্‌ব?

চৈতন্য॥ এসো।

শিবানী বাড়ি যাবার জন্য বের হ'য়ে এল। স্ত্রী যুবতী

শিবানী॥ আজ টাকা দেবে ব'লেছিলে।

চৈতন্য॥ (বাক্স খুলে দেখিয়ে) গড়েব মাঠ।

শিবানী॥ তবে গড়ের মাঠের হাওয়া খেয়েই থেকো—হাড়ি চ'ড়বে না কিন্তু, —আমি বলে যাচ্ছি—হ্যাঁ, আর শোনো, বাড়িওলা শাসিয়ে গেছে আজ সন্ধ্যের মধ্যে অন্ততঃ একমাসের ভাড়া না দিলে, কাল দারোয়ান দিয়ে আমাদের তুলে দেবে। তুমি তো দোকানে প'ড়ে থাকো—

বড়জোর শ্মশানে যাও মড়া পোড়াতে—ছেলে দুটো তোমারই সাথী—ঘর সামলাতে হয় একা আমাকে!—এ আর চলে না! এখন আমার কি ইচ্ছা হয় জানো—গলায় দড়ি দিয়ে মরি। আজ টাকাকড়ি না দিলে তুমি আমার মরা মুখ দেখ্‌বে।

শিবানী চ'লে যাচ্ছিল। চৈতন্য হঠাৎ তার হাত চেপে ধ'রল।

শিবানী ॥ এ কি!

চৈতন্য ॥ আমি দেখ্‌বো।

চৈতন্য হঠাৎ শিবানীর শাড়ীর একাংশ সরিয়ে দেখতে পেল আলাদা আর একটি ন্যাকড়ায় বাঁধা কিছু চপ্‌—শিবানী ঐ চপগুলি লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। চৈতন্য বাঘের মতো থাবা মেরে সে-গুলি হস্তগত ক'রল।

চৈতন্য ॥ তাই আমি ভাবি, মাল কিনে দিই, পুরো জিনিস পাইনা কেন। চোর! ঘরের বউ চুরি করে, এ-ও দেখ্‌তে হ'ল আমাকে!

শিবানী ॥ ভাতার যদি ভাত না দেয়— ঘরের বৌর উপায়? তুমি বাপ হ'য়ে মদ ভাং খেয়ে মড়া পুড়িয়ে বুঁদ হ'য়ে ব'সে থাকতে পারো —কিন্তু ছেলে দুটোর মুখে আমি কি ছাই তুলে দেব মা হ'য়ে। আমার গায়ের গয়না বিক্রি ক'রে, তুমি দিলে দোকান—নাম দিলে 'চাতালের বৈঠক'—এ-দোকানে কে খায় শুনি। কোত্থেকে খাবে। হাফ্‌ কাপ চা ছাড়া, আজ দেশের লোকের খাবার মুরোদ আছে কিছু! দোকানটা তুলে দাও। শ্মশানবন্ধুর ব্যবসাটাই জাঁকিয়ে তোলো! দেখ্‌ছো কি—এর পর লোক খেতে না পেয়ে, মাছির মতন প'ড়বে আর মরবে! এন্তার লাস পোড়াও—আর মদ ভাং খাও! এ আমি ব'লে গেলাম—'চাতালের বৈঠক মাতালের আড্ডা হ'ল ব'লে—

শিবানী চলে যাচ্ছিল।

চৈতন্য ॥ তবে তো বাঁচিরে শালী বাঁচি! তা'—এই গুষ্টির পিণ্ডি ফেলে

যাচ্ছিস কেন? নিয়ে যা! (কিন্তু শিবানী ততক্ষণে পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে)—এই যা—চ'লে গেল! এতো লোক মরে—আমরা মরি না কেন! (আপন মনে হাস্‌তে হাস্‌তে) আমরা ম'লে, আমাদের পোড়াবার লোক জুট্‌বে না, বোধ হয় তাই।

চৈতন্য চপ্‌গুলি ভেতরে রাখ্‌তে গেল। এমন সময় তার দুই ছেলে সুখ ও শান্তি স্কুল থেকে সোজা এখানে ফিরল। বই, শ্লেট, খাতাপত্র রাখবার জায়গায় রেখে জামা খুলে চায়ের দোকানে বয় হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে চৈতন্য তাদের কাছে এসে দাঁড়াল

চৈতন্য ॥ কিরে, তোরা যে আজ আগে ভাগেই ইস্কুল থেকে চলে এলি! পালিয়ে এলি বুঝি!

সুখ ॥ ভূগোলের বই কিনে দিতে পারোনি মাষ্টার ব'ল্‌লে কেলাস্‌ থেকে বেবিযে যা—

চৈতন্য ॥ কর্‌পোরেশনের ফ্রি ইস্কুল—তাড়িযে দিলেই হ'ল। মাষ্টারটার নাম কি, বল্‌ দেখি?

শান্তি ॥ দীনবন্ধু সেন।

চৈতন্য ॥ লোকটা এতোবড়ো একটা ভুল ক'রল কেন। দীনবন্ধু কেন, দযার সাগর বিদ্যাসাগর নামটা নিতে বাধা ছিল কি!—আচ্ছা, সে দেখা যাবে—ভেতরে যা—দুজনে এক-একটা চপ খেয়ে নে—

সুখ ॥ সে কি বাবা। দোকানের চপ আমরা একদিন খেয়েছিলাম ব'লে, তুমি জুতো পেটা ক'রেছিলে—কিরে শান্তি, মনে নেই?

শান্তি ॥ মনে আবার নেই! বুঝ্‌লি না সুখ, উনি আমাদের বাজিয়ে নিচ্ছেন!

চৈতন্য ॥ না, না—আমি ব'লছি—যা গিয়ে খা—তোদের মা তোদের জন্যে তৈরি করে রেখে গেছে—

সুখ ও শান্তি ॥ তাই বলো।

ছুটে দুজনেই ভেতরে চলে গেল। রামবাবু ও যদুবাবুর প্রবেশ।

রাম্ ॥ 'বলো হরি—হরি বোল্!'

যদু ॥ 'বলো হরি—হরি বোল্!' বুড়ীটাকে আমরা পুড়িয়ে এলাম দাদা।

চৈতন্য ॥ পুড়িয়ে এলে তো একটা বুড়ী ভিখিরী—তা' এতো দেরী হ'ল যে?

রাম ॥ তা' দেখলাম ভিখিরীর হাড়ই বেশী শক্ত হয় চৈতন্যদা—

যদু ॥ বোধ হয় খেতে পায় না বলেই হয়! নাঃ। আজকের দিনটা মাঠে মারা গেল! শ্মশানবন্ধু হয়েও না জুট্‌লো একটা বিড়ি—না জুট্‌লো একখানা বাতাসা।

রাম ॥ বরং নিজেদের ধারকরা বিড়িগুলোই গেল। এই সুখ, এককাপ খুব কড়া চা দে বাবা!

যদু ॥ আমাকেও।—এই শান্তি, তার আগে আমাকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে শান্ত কর দেখি বাবা!

চৈতন্য ॥ বুড়ীটা চোখের ওপর মরে গেল! এক ফোঁটা ওষুধও মুখে নিয়ে ম'রল না! তা' ওর শেষ কাজটা তোমরা ক'রে এলে—পুণ্যের কাজই ক'রলে! কোন্ বাড়ীতে কে ম'রছে—কোন বাড়ীতে ডাক্তার ঢুকছে, দরকারী খবরটবরগুলো ঐ আমাদের এনে দিতো। তা' সেও চ'লে গেল। যাক, খদ্দেররা আসছে! ওহে, মধুবাবুর হার্টের ব্যারামটা বেড়েছিল ব'লেই শুনেছিলাম—আজ তো দেখছি, বেশ হাসতে হাসতেই আসছেন।

আপিস-ফেরতা মধু ও শ্যামবাবুর প্রবেশ। মধুর হাতে একখানি খবরের কাগজ

মধু ॥ ওহে চৈতন্য, আজকের খবরের কাগজের সবচেয়ে বড় খবর জানো?

চৈতন্য ॥ সে যা-ই থাক্, ভেজাল সরষের তেলের সের হয়েছে আড়াই টাকা, ইলিসের সের সাড়ে তিন টাকা আর চালের মণ বাইশ, এর চেয়ে কোন খবরই বড় হতে পারে না স্যার।

রাম ॥ না হে না, ও কি আর পড়ে জানতে হয়! সে তো হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

চৈতন্য ॥ তবে ?

মধু ॥ পশ্চিম বাংলায় মৃত্যুর হার নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম। আজ কাগজে বেরিয়েছে।

চৈতন্য ॥ তাই নাকি! তবে বলব আমাদের এই মাণিকতলাটা ঐ দুনিয়ার বাইরে।

শ্যাম ॥ তা নয় তো কি! মধুবাবু আর আমি বলাবলি করছিলাম—এ পাড়ায় তো 'বলো হরি—হরি বোলের' চোটে রাতে ঘুমুতে পারি না। বুঝলে চৈতন, তোমার ঐ শ্মশানবন্ধুদলকে বলে দিয়ো একটু কম চেঁচাতে।

চৈতন্য ॥ ওরা কি সাধে চেঁচায়! সব বেকার বসে আছে। পেট ভরে খেতে পায় না। কতটা বেঁচে আছে চেঁচিয়ে পরখ করে নেয়।

শ্যাম ॥ কিন্তু শুনে আচমকা আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। এমন আঁৎকে উঠতে হয়, কোনদিন পীলে ফেটে মরব। এই সুখ—একপেয়ালা চা, একখানা টোস্ট্। (মধুকে) তুমি কি খাবে দাদা, বলো।

মধু ॥ চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ওহে ছোকরা, আণ্ডার একটা পোচ্—

রাম ॥ এই শান্তি, আর একটা হাফ্ কাপ চা দে!

শান্তির তথাকরণ

মধু ॥ তোমার চাতালের বৈঠকে 'সুখ' 'শান্তি' মূর্তিমান ক'রে রেখেছো হে চৈতন!

শ্যাম ॥ তা' যা' বলেছো! চায়ের দোকান তো কতোই আছে—কিন্তু 'চাতালের বৈঠক' সহরে এই একটি—যেখানে 'সুখ' 'শান্তি' একেবারে বাঁধা!—

মধু ॥ সন্ধ্যে হ'লো—চলি হে চৈতন!

চৈতন্য ॥ এতো সকাল সকাল বাড়ি' ফিরছেন যে কর্তা! হার্টের অসুখটা বুঝি বেড়েছে?

মধু ॥ তুমি জানলে কী ক'রে?

চৈতন্য ॥ পাড়ার লোক, খবরাখবর রাখবো না!

মধু ॥ তা' একটু বেড়েছে! দেখছো কি? কোনদিন টুক ক'রে চলে যাবো! সেদিন আর কেউ না জানুক, তোমরা জানবে বৈ কী! আমার ছেলেপুলেগুলো তো নাবালক! শ্মশানে নিয়ে যাবে তোমরাই!…তা' নিও! কিন্তু, 'বলো হরি—হরি বোল' ব'লে অমন ক'রে চেঁচিও না!

শ্যাম ॥ তা' যা বলেছেন মধুবাবু! এরা এমন ক'রে চেঁচায়—আমার তো ভয় হয়, কোনদিন বাঁধন ছিঁড়ে কাঁধের মড়া খাট থেকে উঠে না পালিয়ে যায়। যাই, আমিও যাই। সুখ, এই নে পয়সা। শান্তি একটু মশলা দে।

পয়সা দিয়ে মশলা নিয়ে মধুবাবুর সঙ্গে শ্যামবাবু চ'লে গেল

রাম ॥ (চৈতন্যকে) নাও দাদা সন্ধ্যের বিক্রি খতম!

যদু ॥ এ-বেলাকতো বিক্রি হ'ল দাদা?

চৈতন্য ॥ কতো আর হ'ল! সারা দিনে চারটে টাকাও হ'ল না। এই সুখ, যা এই টাকাটা তোর মাকে দিয়ে আয়!

সুখ ॥ ছটা লোকের খ্যাঁট—ও একটাকা মা ছোঁবেও না।

চৈতন্য ॥ শালী মরেও না—হাড় জ্বালিয়ে খেলে!

সুখ ॥ খবরদার বাবা! মাকে তুমি ফের শালী ব'লেছ তো, তোমার এই দোকান ঘরে আমি আগুন দোব।

শান্তি রুখে আসে

শান্তি ॥ তা'তে হবে না রে সুখ—বুড়োর দাড়িতে আগুন দোব আমি।

চৈতন্য ॥ দাড়িতে না বাবা, একেবারে মুখে। তোমরা মুখে আগুন না দিলে আমার স্বর্গবাস হবে না তো বাবা।

রাম ॥ আহা! কি সুখ!

যদু ॥ আহা! কি শান্তি দাদা! একেবারে সশরীরে স্বর্গবাস!

সুখ ॥ দেখুন মশাই, বেশী কথা বলবেন না।

শান্তি ॥ আমাদের ঘরের কথায় আপনি ফোঁড়ন দিতে আসেন যে! আমার বাপ তো তবু দুটো টাকা পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারছে—আপনাদের তো, সে মুরোদও নেই।

সুখ ॥ যতো সব শকুনের দল—হা-পিত্তেশ ক'রে ব'সে আছে—কখন কে ম'রবে—মড়া পোড়াতে ডাকবে—

শান্তি ॥ মদ ভাং খেয়ে, মড়া কাঁধে নিয়ে, 'বলো হরি—হরি বোল' ক'রতে ক'রতে শ্মশান ঘাটে গিয়ে মড়া পুড়িয়ে সিকিটা আধুলিটা রোজগার করবে—এই তো মুরোদ—তার আবার কথা!

চৈতন্য ॥ চুপ্ বাবারা চুপ্। তোদের পায়ে পড়ছি—থাম্—ঐ যে হাবুলবাবু আসছে—বোধ হয় হয়ে গেছে!

রাম ॥ সুখ! এক পেয়ালা চা!

যদু ॥ এই শান্তি, ক'রছিস কি! কখন না বলেছি টেংরীর সুপ এককাপ দে!

হন্তদন্ত হ'য়ে হাবুলের প্রবেশ

চৈতন্য ॥ ওরে হাবুল বাবু এসেছে—এক পেয়ালা চা—(হাবুলের প্রতি) আর ডবল ডিমের মাম্‌লেট্ তো?

হাবুল ॥ মামলেট খাওয়া চুকে গেল—মামা দেহ রাখ্‌লেন!

চৈতন্য ॥ কে? মৃত্যুঞ্জয় বাবু?

হাবুল ॥ হ্যাঁ মশাই। জানেন তো—যমে মানুষে লড়াই চলছিল! তা' মশাই, আমরাই হেরে গেলাম—একটু ভালোর দিকে গিয়ে এই একটু আগে হার্ট ফেল্—

যদু, রাম, চৈতন্য ॥ আ—হা—হা !

চৈতন্য ॥ নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়—ছিলেনও শিবতুল্য !

রাম ॥ নাও—পাড়ার একটা ইন্দ্রপাত হ'য়ে গেল !

হাবুল ॥ আমরা দাদা পথে বসলাম !

যদু ॥ না—না। শোকের সময় ঢের পাবেন—এখন যা' ক'রবার তা'ই করুন।

হাবুল ॥ সেই জন্যেই তো আপনাদের কাছে এসেছি।

রাম ॥ আত্মীয়-স্বজনদের সব খবর দিয়েছেন তো ?

হাবুল ॥ পাকিস্তান থেকে এসেছি—আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে পেরেছে মাথা গুঁজে আছে, কাছেভিতে কেউ তো বড়ো একটা নেই—এ-বিপদে এখন আপনারাই আত্মীয়-স্বজন ! (চৈতন্যকে) আপনার হাতে তো একটা দল আছে—শ্মশান বন্ধুর দল—

চৈতন্য ॥ আছে বৈকী !—এমনি সব বিপদে-আপদে দাঁড়াবার জন্যই—একটা সমিতি করেছি বৈ কি আমরা। তা' ভাববার কি আছে ! —এই তো রামবাবু—যদুবাবু—এরাই সব যাবে। ওহে, তোমাদের দলবলকে খবর দাও !

রাম ॥ দিতেই হবে। আপনার ক'জন শ্মশান বন্ধু চাই হাবুলবাবু ? খাট —না খাটিয়া ?

হাবুল ॥ না, না, খাটেই নেব। উদ্বাস্তু হ'য়েই না অবস্থাটা পড়ে গেল ! নইলে একদিন ছিল—

যদু ॥ সে তো আমরা জানি মশাই। মরা হাতী লাখ টাকা—কে না জানে ! তা' হ'লে চৈতনদা—সমিতির খাতাটা বের করো—রসিদটা লিখে দাও।

চৈতন্য ॥ আ-হা—হিসেবটাই হ'ল না—রসিদটা লিখে দাও ! (হাবুলকে) তা' হ'লে খাটেই যাবেন—কেমন ? এবং যাবেন সকীর্তনে ?

হাবুল ॥ (মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল)

চৈতন্য ॥ (একটি ফর্‌ম্ বের ক'রে) সুখ ! এই ফর্‌ম্‌টা রামবাবুকে দাও

তো বাবা। শান্তি! পাইলট পেনটা এনে দে বাবা! হরি হে পার করো!

আদেশমত চটপট্ কাজ হ'ল। রামবাবু ফরম্ ফিল আপ করতে বসলো

রাম ॥ (লিখে যাচ্ছে)
মৃতের নাম……মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।
বয়স……

হাবুল ॥ ষাট।

রাম ॥ (লিখে যাচ্ছে)
বযস……ষাট।

হাবুল ॥ জাতি—হিন্দু ব্রাহ্মণ।

যন্থ ॥ ও-ঘরটা আমাদের নেই।

চৈতন্য ॥ আমাদের কোনো জাতবিচার নেই।

যন্থ ॥ তা' নয় তো কি! ও বাবা, যতো মত—ততো পথ। ডাকলে আমবা শ্মশানেও যাবো—কবরেও যাবো।

রাম ॥ ঠিকানা?

হাবুল ॥ ৭।২, বাঘমারি রোড।

রাম ॥ (ঠিকানা লিখে নিয়ে) ওয়ারিশ?

হাবুল ॥ আমি—ভাগ্নে, হাবুল রায়।

যন্থ ॥ Congratulation মশাই। খুব মেরে দিযেছেন!

হাবুল ॥ কি যে বলেন! কি বা আছে—যে মারবো।

রাম ॥ আরে তবু মশাই—মরা হাতী লাখ টাকা।

যন্থ ॥ প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা তো! তাইবা কে পাচ্ছে? আপনার তো মশাই মামা। আমার তো মশাই বাপই ছিল—কি পেলাম। একপাল পুষ্যি—আর একরাশ দেনা!

রাম ॥ কাজেব সময় কাঁদুনি—তাই আজো তুই বেকার, বুঝলি যন্থ!

হাতে একটা ভালো কাজ এসেছে, ক্ষুর্তি করে লেগে যা—তা না কেবল কাঁদুনি। (হাবুলকে) আপনি বলুন হাবুলবাবু—লাসের ওজন ?

হাবুল ॥ তা' মণ আড়াই হবে—

সুখ ॥ ওরে বাবা !

শান্তি ॥ ওরে বাবা কিরে ? গেল মাসে সেই মাড়োয়াড়ীটা—তিন মণ তেরো সের—

চৈতন্য ॥ এই, তোরা থাম্‌লি ?

রাম ॥ (মুখে মুখে হিসাব) চার আড়াই দশ—ঘাড় বদলাতে আর এক দশ—রিসার্ভ পাঁচ—মোট তা' হলে পঁচিশ জন শ্মশান বন্ধু লাগ্‌বে হাবুলবাবু।

হাবুল ॥ আপনারা যা ভালো বোঝেন—করুন, কিন্তু একটু চট্‌পট্‌ করুন—

রাম ॥ বোঝাবুঝি এতে কিছু নেই—এ'হলো গিয়ে সমিতির নিয়ম মাফিক কড়ায়গণ্ডায় হিসাব ! এইবার টাকার অঙ্কটা—Admission fee পাঁচ টাকা—Carrying fee পঁচিশ জনের মাথা পিছু এক টাকা হিসাবে পঁচিশ টাকা—না না, হাবুলবাবু—শ্মশান বন্ধুরা সব অনারারি কাজ করে—তবে মাথা পিছু এই ফি-টা সমিতিকে advance দিতেই হবে ! সমিতি এই টাকা দিয়ে দুঃস্থের সেবা করে থাকে। জানেন তো হাবুল বাবু—কতো সব সম্ভ্রান্ত লোক দুঃস্থ হ'য়ে পড়েছে—আমাদের সমিতি এ-টাকাটা তাদের মধ্যে গোপন দান ক'রে থাকে।

হাবুল ॥ করুন মশাই—যতো পারেন করুন ! (চৈতন্যকে) এই নিন্ আপনাদের ত্রিশ। কিন্তু দয়া করে এখন চলুন।

চৈতন্য টাকা বাক্সে পুরিল

চৈতন্য ॥ দাও হে রসিদটা দাও—সই করে দিচ্ছি—

হাবুল ॥ রাখুন মশাই আপনার রসিদ—দয়া করে চলুন।

চৈতন্য ॥ Law is Law. রসিদও দেবো—কাজও ক'রবো! বিড়ি-টিড়ি আর এ-টা ও-টার জন্যে সঙ্গে কিছু নেবেন—এ-সব তো জানাই আছে—কি বলেন?

হাবুল ॥ জানি মশাই—জানি। এইবার আসুন।

রাম ॥ হিন্দু যখন জানবেন বৈ কী! শ্রাদ্ধের দিনে শ্মশান বন্ধুদের ভূরি ভোজ খাওয়ালে তবে পরলোকগত আত্মার উদ্ধার—এ-সবও যদি হিন্দুকে মনে করিয়ে দিতে হয়, আপনি আমাকে বল্‌বেন ঠ্যাটা।—তাই ও আর বললাম না—ও-তো আছেই—এইবার (চৈতন্যকে) চৈতনদা, কতো নম্বর স্কোয়াড্?

চৈতন্য ॥ এক নম্বর বেলা পাঁচটায় ফিরে এসেছে—একটু rest চাই। দুনম্বর এখনো ফেরেনি। রিসার্ভ স্কোয়াড্‌কে খবর দাও—যাও বেরিয়ে পড়ো।

রাম ও যদু ॥ বলো হরি হরি বোল্! চলুন হাবুল বাবু—

হাবুল সহ রাম ও যদুর প্রস্থান

চৈতন্য ॥ ব্যাটাচ্ছেলে তোরাও তো রিসার্ভ—যা না—

সুখ ॥ না—আমরা দু'ভাই যাব না।

চৈতন্য ॥ যাবিনা! কেন যাবি না রে হারামজাদা—এমন একটা দাঁও ছেড়ে দিবি?

শান্তি ॥ ছাড়তেই হবে। মা ব'লে দিয়েছে—আজকের রাতের মধ্যে যদি তুমি বকেয়া বাড়ি ভাড়া শোধ না করো—বাজার দেনা শোধ না করো—আর বাড়ির সবাইকে পুরোপেট খেতে না দাও, মা বিষ খাবে। সে লাস্ টান্‌বে কে—তোমার এই শ্মশানবন্ধু শকুনের দল?

চৈতন্য ॥ ভিখিরী সেই বুড়ীটাকে গাঁটের পয়সা খরচ করে ওরা আজ পুড়িয়ে এল—সে খবর রাখিস্? ওরা শকুন নয়রে—ওরা মানুষই! তবে অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, ওদেরও তা-ই হচ্ছে! আমারই হয়েছে। হ্যাঁ রে, তোদের মা কি সত্যি আজ বিষ খাবে! বিষের পয়সা জুট্‌বে কোত্থেকে শুনি?

সুখ ॥ বিষ মা আজ কি খাবে। ও তো কবে থেকে খাচ্ছে। বিষ খেতে পয়সা লাগে না বাবা। কোনোদিন আধপেটা খাচ্ছেন—কোনোদিন খাচ্ছেন না—এইতো বিষ। মরা নিয়ে তো কথা—সে বিষ খেয়েও মরা যায়—কিছু না খেয়েও মরা যায়।

চৈতন্য ॥ দোকানপাট বন্ধ করে চল্ বাড়ি চল্।

শান্তি ॥ শুধু হাতে বাড়ি যেও না বাবা। তিরিশটা টাকা পেয়েছ, নিয়ে মাকে দাও।

চৈতন্য ॥ না, না। ও টাকা তো আমার নয়। যারা মড়া পোড়াতে গেল, এ-টাকা দিতে হবে তাদের। কাল সকালে এই টাকায় ওদের বাজার হবে। আজকের বিক্রীর চারটে টাকাই নিয়ে যাচ্ছি—এই দিয়েই আজ ঠেকাবো—চল্।

সুখ ॥ চপ্‌গুলো তো বিক্রিই হ'ল না—খানদশেক রয়েছে—নিয়ে যাবো ?

চৈতন্য ॥ নিয়ে যাবি ?……নে।…না, থাক্।…ঐ তো আমার কালকের মূলধন। গরম করে দিলেই চ'লে যাবে।

নেপথ্যে 'বলো হরি—হরি বোল' ধ্বনি শ্রুত হ'ল। ধ্বনি ক্রমশঃ নিকটবর্তী হ'তে লাগ্‌ল। সুখ শান্তি দোকান বন্ধ ক'রবার উদ্যোগ ক'রতে লাগ্‌ল। চৈতন্য একমনে 'ব'লো হরি—হরি বোল' ধ্বনি শুন্‌ছিল। সুখ শান্তি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাপের কাছে এসে দাঁড়াল

সুখ ॥ কি ভাবছো বাবা ?……যাবে না ?

চৈতন্য ॥ ……ভাবছি, তোরা কবে আমাকে অমনি ক'রে নিয়ে যাবি। (হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌লো) 'বল হরি—হরি বোল'—(চাবি-গোছা তুলে নিয়ে) 'বল হরি—হরি বোল'—চল্ বাবারা চল্—

তিনজনে দোকান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ক্রমবর্ধমান 'বলো হরি—হরি বোল' ধ্বনির মধ্যে যবনিকা প'ড়ল।

যবনিকা

স্বদেশ
শারদীয়া সংখ্যা
১৩৬৩

টোটোপাড়া

—প্রস্তাবনা—

প্রেক্ষাগৃহে সমবেত দর্শকদের উদ্দেশে সূত্রধারের ভাষণ

সূত্রধার ॥ আমাদের এই ভারতে সবচেয়ে কম সংখ্যক লোকের যে জাতটি তার নাম জানেন কি? সে জাতটি হল গিয়ে একটি উপজাতি। নাম টোটো। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে এদের মোট সংখ্যা ছিল ৩৩৪ জন। ২০ বছর বাদে, গেল ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মোট ৩১৪ জন। হ্যাঁ, মাত্র ৩১৪ জন। এতে বোঝা যায় যে এদের সংখ্যা কমতির মুখে। দেখেছেন কোন টোটো? না দেখে থাকেন, যাবেন সেখানে? কোথায় জানেন? টোটোপাড়া। হ্যাঁ, ছোট্ট একটি গ্রাম। আর ছোট এই গ্রামটিতেই বাস করে সমগ্র টোটো উপজাতি, যার লোকসংখ্যা মাত্র ৩১৪। ও, নামও শোনেন নি? তা না শোনবারই কথা। কিন্তু এখন তো শুনতে হবে, সংখ্যায় ৩১৪ জন হলেও এরাও ভারত-সাধারণতন্ত্রের অংশীদার। হাতের পাঁচটি আঙুলের ক'ড়ে আঙুলটিকে ভোলা চলে না। চলুন টোটোপাড়ায়। জলপাইগুড়ি জেলার ভূটান সীমান্তে ছোট্ট গ্রাম সেই টোটোপাড়া, হিমালয়ের ছায়ায় দুর্গম বনের অন্তরালে ঢাকা টোটোপাড়া, দুরন্ত তোরসা নদীর ধারে উঁচু নীচু মাটির বুকে, ওই টোটোপাড়া গ্রামে বাস করছে ৩১৪ জন টোটো; পাশেই বাস করছে, গভীর অরণ্যে বুনো হাতী আর গণ্ডার, বাঘ আর ভালুক, সাপ আর ময়ূর। এত সব অসুবিধে

থাকলেও এরা কিন্তু এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা কোনদিন মনেও আনে নি। ভারি ভালবাসে এরা এদের গ্রামটিকে। চাষবাসই টোটোদের প্রধান উপজীবিকা। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও লাঙল দিয়ে চাষ করা তারা একেবারেই জানত না। পরিবার পিছু জমি এদের আলাদা করে ভাগ করা নেই, গোটা মৌজাটাই এদের সর্দারের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া আছে। মৌজার মধ্যে এরা যার যেখানে সুবিধা ভুট্টা, মারোয়া, কাউন প্রভৃতি শস্যের ঝুম চাষ করে। টোটোদের আর একটি প্রধান উপজীবিকা হল কমলালেবুর ব্যবসা। ভুটান থেকে কমলালেবু বয়ে এনে এরা সমতল অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে।

এদের বাসের পদ্ধতি শুনবেন? জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে এরা বাঁশের মাচার ওপরে ঘর তৈরি করে। তারই নীচে শুয়োর, মুরগি প্রভৃতি জীবজন্তু খোয়াড়ের মত করে রাখে। গৃহপালিত জন্তু নিয়ে একই আশ্রয়ে থাকতে হয় বলে এদের গৃহ-পরিবেশটি নোংরা।

বারো রাজপুতের তেরো হাড়ি—একটা কথা আছে। শুনে আশ্চর্য হবেন, তেমনি এই ৩১৪ জন লোকের মধ্যে ১৫টি গোষ্ঠী। একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের প্রচলন নেই। কোন্ গোষ্ঠীর লোক কোন্ গোষ্ঠীতে বিয়ে করতে পারে তা নির্দিষ্ট আছে। এর ফলে অল্পসংখ্যক লোকের মধ্য থেকেই পাত্র-পাত্রী বাছাই করতে হয়। দশ বছরের ছেলের সঙ্গে বিশ বছরের যুবতীর বিয়ে বিরল নয়। এদের মধ্যে সন্তান হওয়ার আগে বিয়ে পাকাপাকি হয় না এবং এর আগে প্রথা-মত এরা সঙ্গী বদল করে নূতনভাবে ঘর বাঁধতে পারে। কিন্তু সেটা প্রথামত হওয়া চাই।

এবার শেষ কথাটি বলি। জাতটি খুব শান্তিপ্রিয়। মারামারি ও রক্তপাত তারা করে না। সে রকম হাতিয়ারও এদের নেই। সংখ্যায় এরা এত কম বলেই জীবনের দাম এদের কাছে অত্যন্ত বেশী।

মারামারি কাটাকাটি করে মরলে ৩১৪ জন লোক শেষ হতে কদিন! এরা যে আজও টিকে আছে, তার কারণই হচ্ছে নরহত্যা এদের ধর্মের নিষেধ। এদের দেবতা হলেন ইসফা, তিনি বাস করেন বাদুপাহাড়ে। আর চিমা হলেন গিয়ে গৃহদেবী। এদের কোন পুরোহিত নেই। টোটোরা নিজেরাই এদের পুজো করে।

হোক না কেন এরা ৩১৪ জন লোক। কিন্তু আমার আপনার মতই এদেরও সুখ আছে, দুঃখ আছে, আনন্দ আছে. বেদনা আছে। দেখতে চান? ওই দেখুন টোটোপাড়ায় অপরাহ্ন ঘনিয়ে আসছে। খোলা জায়গায় ওই নাগকেশর-গাছটিকে কেন্দ্র করে একটি বাঁশের মাচা বসবার জন্য তৈরি হয়েছে, দেখুন। দু পাশে দুটি বাড়ি গাছপালায় ঢাকা পড়েছে। একটি বাড়ি হল গিযে পেস্তা টোটোর। পেস্তার বয়স চল্লিশ। তার বউ যমনার বয়স কুড়ি।

অন্য বাড়িটি হচ্ছে পেস্তারই ছোট ভাই লাবেজের। পঁচিশ বছরের ফুর্তিবাজ ছোকরা। তারও বউ আছে। নাম হল কুপিনী। বছর আঠারো বয়স হবে।

নাগকেশর গাছের তলে পেস্তা টোটো একমনে একটি অর্ধসমাপ্ত দোলনা সমাপ্ত করবার কাজে নিযুক্ত। লাবেজ টোটো তার বাড়ী হতে এল হাতে একটি দা, পিঠে একটি ঝোলা, হাতে একটি কলসী। তার পিছে পিছে এল তারই স্ত্রী· কুপিনী।

প্রথম খণ্ড

কুপিনী॥ লাবেজ! লাবেজ! হি লাবেজ! বনে তু একলা না যাবি।

লাবেজ॥ একলা না যাবে তো আর কে যাবে!···তু যাবি?

কুপিনী॥ ও-বাবা, বনে হামি না যাবে, তোর মতলবটা হামি বুঝি, হামাকে বনে নিবি—বনে বাঘ আছে, ভালুক আছে, গণ্ডার আছে, উদের

মুখে হামাকে ঠেলে দিবি, তু হামাকে মারবি, নতুন বহুর সখ তোর, তোকে হামি জানে।

লাবেজ ॥ (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) দূর পাগলী, তোর মাথাটা খারাপ হোল, তু এলি, তবে না আমার ঘর হোল, বাড়ী হোল, এখন একটা বাচ্চা হবে, তুকে যদি হামি মারবে, তবে হামার কি থাকবে ? তু হামার আঁধার ঘরের পিদিম আছিস, চলি, হামি চলি।

কুপিনী ॥ তু কি আনবি ? হামার জন্মে বন থেকে কি আনবি ?

লাবেজ ॥ মৌ ভাঙ্গবে—মধু আনবে।

কুপিনী ॥ সেদিন তু বললি—মধু আনবি, আনলি তু বাঘা ওল, আর কুকুর—কচু।

লাবেজ ॥ আজ হামি ঠিক মধু আনবে।

কুপিনী ॥ তু একলা যাবি, হামার বড ডর লাগে। কাল শুনলাম, উ বনে একটা বুনো হাতি এলো। এ লাবেজ, দ্যাখনা, তোর পেস্তা দাদা, উ যদি তোর সাথে যায়।

পেস্তার প্রতি লাবেজর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল

লাবেজ ॥ এ কুপিনী, তু কি বলছিস ? হামার পেস্তা দাদার বহুটাকে তো তু জানিস, যমনা বুড়ি উকে না ছাডবে।

কুপিনী ॥ তু বলনা—তু দ্যাখ না।

লাবেজ ॥ আচ্ছা বলবে, তু হামাকে আজ পান না দিলি, গুয়া না দিলি, যা যা—চটপট আন।

কুপিনীকে বাড়ীর দিকে লাবেজ ঠেলিয়া দিল। কুপিনী পান আনিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল, এক হাতে হুঁকো ও অপর হাতে পানের বাটা লইয়া পেস্তার স্ত্রী যমনা তাহার বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া লাবেজ ও কুপিনীর কথাবার্তা তাহাদের অলক্ষ্যে শুনিতেছিল। লাবেজ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল পেস্তার সম্মুখে। যমনা একটু আড়াল হইয়া রহিল।

লাবেজ ॥ এ পেস্তা দাদা !

পেস্তা ॥ হামি না যাবে।

লাবেজ ॥ কুথা না যাবে।

পেস্তা ॥ বনে না যাবে ?

লাবেজ ॥ তু কি কবে জানলি হামি বনে যাবে ?

পেস্তা ॥ তোব বহুকে তু যা বললি উ তো চুপি চুপি না বললি, হামি শুনলাম। এ লাবেজ, তোব গলা আছে, হামার ভি কান আছে।

লাবেজ ॥ আছে, তো আছে। তবে ছাখ দাদা—তোর বুদ্ধিটা কম আছে।

পেস্তা ॥ কম আছে! বুদ্ধি হামার কম আছে!

লাবেজ ॥ না আছে? ইটা তু কি বানাস? (দোলনটাকে দেখাইয়া) দিনের পব দিন—মাসেব পর মাস বোকাব মত বসি বসি ইটা তু কি বানাস ?

পেস্তা ॥ দোলনা।

লাবেজ ॥ কেনে ?

পেস্তা ॥ তু একটা চ্যাংডা আছিস, তু কি বুঝবি ?

লাবেজ ॥ কিছু কিছু বুঝি—কিছু কিছু না বুঝি। কুপিনীব বাচ্চা হলে হামি ভি একটা দোলনা বানাবে, চলি।

হাতে হুঁকো ও পানের বাটা লইয়া যমনা আসিযা দাঁড়াইল
পেস্তার হাতে হুঁকোটি তুলিয়া দিল এবং পানের বাটাটি লইয়া লাবেজের মুখোমুখি দাঁড়াল

লাবেজ ॥ (যমনাকে) পান ?

যমনা ॥ (যাদুকরীব দৃষ্টিতে) হাঁ।

লাবেজ ॥ (কুপিনী আসিল কিনা দেখিল, আসে নাই দেখিযা) হামাকে একটা দিবি ?

যমনা ॥ হামি কেনে দেবে ? কুপিনী দেবে।

লাবেজ ॥ কৈ দিল, না দিল। তু দে।

যমনা ॥ কেনে দেবে? তু হামাকে কি দিবি?

লাবেজ ॥ মধু দেবে—লিবি?

যমনা ॥ (পেস্তাকে দেখাইয়া) উ হামাকে মধু না দেবে, কেনে জানিস?

লাবেজ ॥ কেনে?

যমনা ॥ উ বলবে হামি ওর মধু আছে, উ বলবে যমনার চেয়ে মধু মিষ্টি না আছে।

পেস্তা ॥ এ যমনা, তু এসব কি বলছিস? ভাগ—

যমনা ॥ (লাবেজকে) ভাগ ছোড়া—ভাগ—

লাবেজ ॥ পান দিবি তবে ভাগবে।

যমনা ॥ আমাকে যদি আবার একটা পরগাছা ফুল দিবি—সেই দুধের মত ধবধবে সাদা পরগাছা ফুল, তবে হামি পান দেবে।

লাবেজ ॥ আচ্ছা, দেবে।

যমনা ॥ লে।

লাবেজ পানে হাত দিয়াছে, এমন সময় পান লইয়া হেই লাবেজ! কুপিনীর প্রবেশ

কুপিনী ॥ (দৃশ্যটি দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল) লাবেজ!

যমনা ॥ এ কুপিনী, একটা ঝাটা আন, তোর মানুষটাকে মার, তোর পানে ওর মন না ভরবে—হামার পান খাবে। (লাবেজকে) ভাগ—

তখন কুপিনি লাবেজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কুপিনীকে দেখিয়া ভয়ে প্রকাণ্ড একটি হাঁ করিল কুপিনী সঙ্গে সঙ্গে নিজের হস্তস্থিত পানটি লাবেজের মুখে পুরিয়া দিল, লাবেজ সঙ্গে সঙ্গে মুখ বুজিল।

কুপিনী ॥ (লাবেজকে ঠেলা দিযা) ভাগ—

কুপিনী লাবেজকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া চলিল এবং উভয়ে দৃশ্য হইতে অন্তর্হিত হইল। যমনা খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

পেস্তা ॥ (দোলনাটি রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া যমনার কাছে দাঁড়াইল এবং

চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল) থাম্। রাতভর হাড়িয়া খালি, তু পাগলা হলি, তু মরবি।

পেস্তার ধমক খাইয়া যমনার তৎক্ষণাৎ কেমন ভাবান্তর হইল। হাত হইতে তাহার পানের বাটা পড়িয়া গেল। মুহূর্তে যেন সে স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গেল—দৃষ্টি হইল অপলক, দেহ হইল নিশ্চল। যমনা যেন এক ভূতাবিষ্টা মূর্তিতে পরিণত হইল। তাহার এই রূপান্তরিত মূর্তি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল সে যেন পাথরে খোদাই একটি দেবী মূর্তি। কণ্ঠে যেন তাহার দৈব বাণী। পেস্তা তাহার এই রূপান্তর দেখিয়া ভয় পাইল।

যমনা ॥ শুন। দুনিযার তিনশ চৌদ্দ টোটো, শুন।

পেস্তা ॥ যমনা—যমনা—

যমনা ॥ হামি কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্নে হামি আমাদের দেবতা দেখলাম।

পেস্তা ॥ যমনা।

যমনা ॥ খোদ ইসফাকে দেখলাম।

পেস্তা ॥ (সাশ্চর্যে) ইসফা ?

যমনা ॥ ইসফা।

হঠাৎ আর্তনাদ করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পেস্তা তাহাকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ডাকিতে লাগিল।

পেস্তা ॥ যমনা—যমনা—যমনা—তু কি দেউসী হলি ?

ক্রমাগত ঝাঁকুনি খাইয়া যমনার মোহ কাটিয়া গেল—তাহার ঘুম যেন ভাঙ্গিযা গেল। সে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল

যমনা ॥ কি হোল ?

পেস্তা ॥ যমনা তু কি দেউসী হলি ?

যমনা ॥ হামি জানি না। কি যেন হামি সব সপ্‌নো দেখলাম। ইসফাকে হামি দেখলাম। স্বপ্নে হামি একটা গান পেলাম।

পেস্তা ॥ স্বপ্নে তু গান পেলি ? এ তু কি বলছিস্ যমনা ।

যমনা ॥ পেলাম, পেলাম, হামি একটা গান পেলাম । হামি—হামি ঘুমুবে । আবার হামি ঘুমুবে । হামাকে শুইয়ে দে পেস্তা, হামার বিছানায় শুইয়ে দে ।

ঘরের দিকে অগ্রসর হইল । পেস্তা তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল...এদিকে নেপথ্যে বহুলোকের কণ্ঠ শোনা গেল । ক্রমশঃ মনে হইতে লাগিল একদল টোটো ঢ্যাট্‌রা সহযোগে কি যেন ঘোষণা করিতে করিতে আসিতেছে । কাজী পরিচালিত সেই টোটোর দল ক্রমশঃ এখানে আসিয়া পড়িল এবং তাহাদের ঢ্যাট্‌রা সহযোগে ঘোষণা চলিতে লাগিল । এই ঘোষণার মধ্যে ওদিক হইতে কুপিনী এবং এদিক হইতে পেস্তা আসিয়া দাঁড়াইল এবং ঘোষণা শুনিতে লাগিল ।

কাজী ॥ হামাদের টোটো পাড়া যে না জানবে সে মানুষ না আছে ।

টোটোগণ ॥ কাজীর বাৎ ঠিক আছে । (ঢ্যাটরা)

কাজী ॥ ভর দুনিয়ায় তিন শ চৌদ্দ টোটো আছে । যদ্দিন ভূটান পাহাড় আছে—

টোটোগণ ॥ ভূটান পাহাড় আছে—

কাজী ॥ ইসফা দেবতা আছে—

টোটোগণ ॥ ইস্ফা দেবতা আছে—

কাজী ॥ টোটোলোকের সর্দার আছে—

টোটোগণ ॥ টোটোলোকের সর্দার আছে—

কাজী ॥ তোরসা নদী আছে—

টোটোগণ ॥ তোরসা নদী আছে—

কাজী ॥ জঙ্গল ভরা জানোয়ার আছে—

টোটোগণ ॥ জঙ্গল ভরা জানোয়ার আছে—

কাজী ॥ হোক না কেন তিনশ চৌদ্দ টোটো, টোটো কাউকে ডরে না ।

টোটোগণ ॥ টোটো কাউকে ডরে না। (ঢ্যাট্ রা)
টোটো কাউকে ডরে না। (ঢ্যাট্ রা)
টোটো কাউকে ডরে না। (ঢ্যাট্ রা)

কাজী ॥ তিন শ চৌদ্দ টোটো আছে, আজ একটা টোটো বাডলো।

টোটোগণ ॥ উবু, উবু উবু……

কাজী ॥ কার ঘরে বাডলো ?

টোটোগণ ॥ তিতরী টোটো—

কাজী ॥ তিতরীর ঘরে আজ ছেলে হোল
আঁধার ঘর আলো হোল
সর্দারের হুকুম হোল
সব টোটো হাড়িয়া দেবে।
সেই হাডিয়া এই কাজী খাবে।
তবে কাজী মন্তর পডবে
তিত্ রীর ব্যাটা চাঙ্গা হবে
কোথা পেস্তা কোথা লাবেজ
হাডিয়া দে হাডিয়া দে ॥

টোটোগণ ॥ কোথায় পেস্তা কোথায় লাবেজ
হাডিয়া দে হাডিয়া দে। (ঢ্যাট্ রা)

সকলে সবিস্ময়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইল। যমনা একটা সাদা কাপড়ে সারা দেহ জড়াইয়া পূর্ববৎ ভূতাবিষ্টের মত অট্টহাস্য হাসিতে হাসিতে এখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে তাহাকে দেখিয়া স্তব্ধ স্তম্ভিত হইল।

পেস্তা ॥ কাজী! কাজী! উ আর মানুষ না আছে, দেউসী হোল।

কাজী ॥ চুপ! সব চুপ!

ক্ষণিক নিস্তব্ধতা

যমনা ॥ কাল রাতে ইসফা আমার কাছে এল
কাঁদতে কাঁদতে এল।
গাইতে গাইতে বলল
যমনা, তুই এই গান গা।
লাখো লাখো টোটো ছিল আমার ছেলে আর মেয়ে
মরতে মরতে সব গেল—
আঙ্গুল দিয়ে গোণা যায় এখন আমার ছেলে
যে ছেলে মরল সে ছেলে আর না ফিরল
কমতে কমতে আমার সব গেল।
ওরে যমনা তোর কোল খালি কেন ?
তোর ঘর আঁধার কেন ?
তোর পুজা আমি না নিবে।
তোর হাড়িয়া আমি না খাবে।
যেদিন তু মা হবি
সেদিন আবার আসব
সেদিন আবার হাসব
আজ আমি কাঁদছি
আজ আমি চললাম।

কাজী ॥ (সভয়ে চীৎকার করে)······দে-উ-সী !
যমনা ॥ (গান শেষ হইলে অট্টহাস্যে চিৎকার করিয়া উঠিল)
আগুন জ্বালবে। টোটো পাড়ায় হামি আগুন জ্বালবে।

অট্টহাস্য করিতে লাগিল। টোটোগণ ভয়ে হাটু গাড়িয়া হাত জোড় করিয়া বসিয়া পড়িল

কাজী ॥ এটা দেউসী না, এটা ডাইনী, সবাই ওকে ধর, এ পেত্তা এক জোড়া

মুরগি আন, বলি হবে, হামি মন্তর পড়বে, এখনি সব ঠাণ্ডা হবে।

সকলের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য। পেন্তা উদভ্রান্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এমন সময় এক গাছা পরগাছা ফুল হাতে লাবেজের প্রবেশ

লাবেজ॥ কি হোল, এখানে কি হোল?

লাবেজকে দেখা মাত্র যমনার অট্টহাস্য চট করিয়া থামিয়া গেল। লাবেজ ধীরে ধীরে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই যমনা ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। জনতা এ দৃশ্য দেখিয়া স্তব্ধ হইল এবং যে যেখানে ছিল সেখানেই চিত্রাপিতের ন্যায় পরবর্তী ঘটনার জন্য সাগ্রহে স্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যমনা॥ (লাবেজের প্রতি সানুরাগে তাকাইযা) পরগাছা ফুল?

লাবেজ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল) হ্যাঁ।

যমনা॥ তু আনলি?

লাবেজ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল) হ্যাঁ।

যমনা॥ কুপিনীর জন্যে আনলি?

লাবেজ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল)—না।

যমনা॥ ই তবে হামার?

লাবেজ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল)—হ্যাঁ।

যমনা॥ (তাহার হাত হইতে পরগাছা ফুলগুচ্ছ পরমাগ্রহে ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া লইল এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফুল গুচ্ছের দিকে এবং লাবেজের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।)

কাজী॥ ফুলপরী! ফুলপরী! ফুল যেই দেখল, ঠাণ্ডা হোল।

টোটোর দল॥ বাঁচা গেল। (চ্যাটরা)

কাজী॥ এ লাবেজ, তু বাহাদুর বটে। এ পেন্তা, তোর বাড়ীর চার কোণে চারটা ফুল গাছ পুতবি। জবাফুল, গাঁদাফুল, ইন্দ্রিফুল, মিন্দ্রিফুল।

ফুল ফুটবে, ফুলপরী খুসী থাকবে। তোর বহুর ঘাড়ে ভর না করবে। সব কিছু ঠাণ্ডা থাকবে। চল, চল সব, চল। তিতরী টোটোর বাড়ী চল। হাড়িয়া লিয়ে চল—সেই হাড়িয়া হামি খাবে, তিত্রীর ব্যাটা চাঙ্গা হ'বে।

ঢ্যাট্রা বাজিয়া উঠিল

টোটোর দল। তিত্রী টোটোর বাড়ী চল
এক কলসী হাড়িয়া মিলবে
কাজী খাবে, হামরা খাবে
তিতরীর ব্যেটা চাঙ্গা হবে।

ঢোট্রা দিতে দিতে সকলের প্রস্থান

পেস্তা ॥ যাবি যমনা, তু যাবি ?

যমনা ॥ তু যা, হামি না যাবে। হামি আজ এ ফুল মাথায় পরবে, হামি আজ মনের মত সাজবে। তু যদি যাবি, যা।

ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল

পেস্তা ॥ আলবৎ যাবে। তু ঠাণ্ডা হলি হামি, এখন ভরপেট হাড়িয়া খাবে।

কুপিনী ॥ (লাবেজের কাছে আসিয়া) হামার মধু ?

লাবেজ ॥ বুনো হাতী পথে পড়ল।

কুপিনী ॥ তার ভয়ে তু গাছে চড়লি ?

লাবেজ ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল) হঁ্যা।

কুপিনী ॥ পরগাছা ফুল পাড়লি ?

লাবেজ ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল) হঁ্যা।

কুপিনী ॥ ভাগ্যিস্ পাড়লি, তাইনা আমার যমনা দিদি ঠাণ্ডা হোল।

কুপিনী নিজের বাড়ীর দিকে চলিল

লাবেজ ॥ কুপিনী, কুপিনী !

কিন্তু কুপিনী তাহাতে কর্ণপাত করিল না—সে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল

লাবেজ ॥ (কি করিবে বুঝিতে পারিল না, বিপন্ন হইয়া বলিয়া উঠিল) হামাকে বকবে না, হামাকে মারবে না, এমনি করে, ও শালী হামাকে চাবুক মারবে। কুপিনী, কুপিনী !

কুপিনীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিযা গেল

যমনা ॥ (মাচার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। লাবেজকে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে দেখিযা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ থামিয়া গেল। পরে পুষ্পগুচ্ছের দিকে একদৃষ্টে তাকাইযা রহিল। হঠাৎ তাহাও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, এবং দুহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইযা কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় হাড়িযা লইয়া ঘর হইতে পেস্তা বাহির হইযা আসিল এবং যমনাকে ঐ অবস্থায দেখিয়া, সে ধীরে ধীরে যমনার কাছে আসিয়া, যমনার মুখ হইতে তাহার হাত দুখানা সরাইয়া দিল।)

পেস্তা ॥ তু কাঁদছিস্ কেনে যমনা ?

যমনা ॥ তু হামাকে ফুল না দিলি।

পেস্তা ॥ দেবে দেবে। বাড়ীর চার কোণে চারটা ফুল গাছ পুঁতবে। একটা জবা ফুল, একটা গাঁদা ফুল, একটা ইন্দ্রি ফুল, একটা মিন্দ্রি ফুল। চল্, ওঠ, চল !

যমনা ॥ কুথা ?

পেস্তা ॥ তিত্‌রী টোটোর বাড়ী।

যমনা ॥ কেনে ?

পেস্তা ॥ তিত্‌রী টোটোর খোকা হোল, টোটোপাড়ার এক টোটো বাড়লো। টোটোর আজ একটা মস্ত পরব। আজ নাচের দিন, গানের দিন, ফুর্তির দিন। এসব দিনে হামরা ঘরে না থাকবে। আজ পেট ভরে সব হাড়িয়া খাবে, চল, যমনা।

যমনা ॥ না।

পেস্তা ॥ না যাবি ?

যমনা ॥ না।

পেস্তা ॥ থাক্—হামি যাবে।

পেস্তা চলিয়া যাইতেছে। যমনা তাহাকে আর্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল

যমনা ॥ এ—শুন—'লেলাই এটা'।

পেস্তা কাছে আসিল

পেস্তা ॥ বল্।

যমনা ॥ তুই ভাবিস না, হামার ভি ছেলে হবে।

পেস্তা ॥ দূর।

যমনা ॥ দূর বলবি তো হামার ছেলে তোকে বাপ না বলবে।

পেস্তা ॥ দূর—দূর—। তোর ছেলে হবে তো কবে হোতো। তিন তিনটে বছর গেল। মিছা কথা। তোর কথায় হামি আর না ভুলবে, ঐ দোলনাটা হামি তিত্‌রীর বেটাকে দেবে, হামি নিলাম, চললাম।

পেস্তা ছুটিয়া চলিয়া গেল। যমনা ক্ষণকাল সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হঠাৎ সম্মুখে নিক্ষিপ্ত পরগাছা ফুলটির দিকে তাকাইল। এদিকে ওদিকে চোরের মত তাকাইয়া হঠাৎ পরগাছা ফুলটি তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল এবং ছুটিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল

॥ পর্দা ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

অপরাহ্ণ

লাবেজের স্ত্রী কুপিনী কমলালেবুর শূণ্য ঝুড়ি নিয়ে তার 'যা' যমনাকে সঙ্গে নিয়ে ভুটান পাহাড়ে কমলালেবু আনতে যাবার উদ্দেশ্যে এসে নাগকেশর ফুল কুড়িয়ে মাথায় গুঁজছে, আর ডাকছে—

কুপিনী ॥ হে দিদি। বেলা পড়ল, ঘুম ভাঙল না তোর? 'লেলাই-এটা'—চলে আয়—চলে আয়।

কুপিনী গান ধরল*

পাহাড়তলীর কমলা গাছ
কাঁদছে বেদনায—
ফলের ভারে নুযে তারা
করছে "হায হায"।
ফলের ভারে নুয়ে তাদের
কান্না খালি পায।
টোটোপাড়ার মেয়ে তোরা
আয় রে ছুটে আয॥'

বাঁশের ঝুড়ি তৈরি-রত যমনার প্রবেশ। তাকে দেখেই কুপিনী খিল খিল করে হেসে উঠল

কুপিনী ॥ কি রে বুড়ী, যাবি না তুই?

যমনা ॥ না, যাবে না! হামার ঘরে কমলালেবুর পাহাড আছে।···হেই কুপিনী—

কুপিনী ॥ কি যমনা দিদি?

---

* গানটি শ্রীসজনীকান্ত দাসের দান।

যমনা ॥ 'লেলাই-এটা'—কাছে আয়।

কুপিনী কাছে এসে দাঁড়াল

কুপিনী ॥ বল্ বুড়ী, কি বলবি, বল্।

যমনা ॥ তোর আয়না নেই? না থাকবে তো তোরসা নদী তো আছে। নদীর জলে নিজের মুখটা দেখবি, দেখে বলবি কে বুড়ী—কে ছুঁড়ী। আর তা যদি না দেখবি তোর ঘরের লোককে পুছবি—কে বুড়ী—কে ছুঁড়ী। (কুপিনীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল যমনা) যা।

কুপিনী ॥ দেমাক দেখে বাঁচি না। এত তোর বয়েস হল—কোলে একটা ছেলে না এল। রূপ ধুয়ে তুই জল খা। লোকে তোকে ডাইনী বলে, ঠিক বলে, ঠিক বলে।

কুপিনী ছুটে চলে গেল। যমনা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নাগকেশরের নীচে মাচার ওপরে বসে বাঁশের ঝুড়ি বোনবার কাজে লেগে গেল। হাটে যাবার সাজে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তার স্বামী পেস্তা টোটো

যমনা ॥ এই, কোথায় চললি?

পেস্তা ॥ যাবে মাদারিহাট।

যমনা ॥ এই শোন্, শোন্।

পেস্তা যমনার কাছে এসে দাঁড়াল

পেস্তা ॥ কি বলবি বল্?

যমনা ॥ মাদারিহাট তু ক্যানে যাবি?

পেস্তা ॥ সর্দারের গাড়ি নিয়ে যাবে। সর্দার চাল কিনে আনবে, তেল কিনে আনবে, নুন কিনে আনবে।

যমনা ॥ তু কি কিনবি?

পেস্তা ॥ হামি কি কিনবে? পয়সা মিলবে কোথায়?

যমনা ॥ চিনির বস্তা বয়ে বয়ে মরে সর্দারের বলদটা, একদানা চিনি বলদটা না খাবে। তু সর্দারের আর একটা বলদ, চালের বস্তা বয়ে বয়ে মরবি, একদানা চাল না পাবি।

পেস্তা ॥ তু হামাকে বলদ বলছিস্ ?

যমনা ॥ বলছি। ক্যানে বলবে না ? তু মরদ না আছিস।

পেস্তা ॥ হামি মরদ না আছে।

যমনা ॥ না, মরদ আছে সর্দার। উরা ভাত খায়—তোর মত কচু না খায়। সর্দারের তিন-তিনটা ছেলে। এত বয়স হল তোর, একটা ছেলে না হল। তু মরদ না আছিস। তোর ভাই, ওই লাবেজ ছোঁড়া, ও-ও মরদ আছে—তু না আছিস।

পেস্তা ॥ লাবেজ ভাত খায় ?

যমনা ॥ খায়—এক বেলা খায়।

পেস্তা ॥ লাবেজ ছেলের বাপ আছে ?

যমনা ॥ হবে—একদিন হবে।

পেস্তা ॥ হামিও হবে।

যমনা ॥ তিন তিনটা বছর এমনি গেল, লাবেজের বহু ওই কুপিনী পেত্নীটা—উ হামাকে শুনাল, আমার কোলে ছেলে এল না, আমাকে ডাইনী বলল। (ছলছল চোখে) ক্যানে বলবে না, তু বল্।

পেস্তা ॥ যমনা !

যমনা ॥ তু আমাকে কি দিলি। ভাত না দিলি, কাপড় না দিলি, ছেলে না দিলি—

পেস্তা ॥ দেবে, একদিন দেবে—তু থাম্, তু থাম্ যম্না।

পেস্তা তাকে আদর কর ছল, লাবেজ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে চলেই যাচ্ছিল। যমনা তাকে ডাকল

যমনা ॥ এ লাবেজ, 'লেলাই-এটা'! শুন্।

লাবেজ এদের কাছে এসে দাঁড়াল। যমনা তার গলা থেকে হারটি (টিসা) খুলে নিয়ে লাবেজের সামনে ধরল

যমনা ॥ (লাবেজকে) তোর যদি আঁখ থাকে তো তবে দেখে লে। এমন টিসা টোটোপাড়ায় আর কার আছে বল্ ?

লাবেজ ॥ না আছে।

যমনা ॥ কত দাম আছে বল্।

লাবেজ ॥ হামি জানে। ওঁর দাম সাত টাকা আছে।

যমনা ॥ ইটা আমাকে কে দিলে জানিস ?

লাবেজ ॥ দাদা দিলে।

যমনা ॥ তোর বহুকে দিবি ? ইটা তু নিবি ?

পেস্তা ॥ (আগুনের মত দপ করে জ্বলে উঠে) যম্‌না !

যমনা ॥ তু থাম। তু দিলি—এ এখন হামার আছে। হামার যা খুশী করবে—তু বোলবার কে ? এই লাবেজ, সাত টাকার মাল হামি পাঁচ টাকায় তোকে দিবে। পাঁচটা টাকা দে—লে।

পেস্তা ॥ (বজ্র নির্ঘোষে) লাবেজ !

যমনা ॥ (লাবেজকে) তু তো মরদ আছিস লাবেজ, কিসের ডর তোর ? লে।

লাবেজ ॥ (ট্যাঁক থেকে দশ টাকার একটি নোট বের করে) হামি লিবে—পাঁচ টাকা ক্যানে ? সাত টাকা দাম আছে, হামি দশ টাকা দিবে।

যমনা ॥ তুই তো রাজা আছিস লাবেজ !

লাবেজ দশ টাকার নোটখানি যমনাকে দিয়ে টিসাটি হাতে নিয়ে দেখতে লাগল

পেস্তা ॥ (যমনাকে) উ টাকা তু কী করবি ?

যমনা ॥ তোকে দিবে। না দিবে তো, তু আর হামি কি খাবে ?

পেস্তা ॥ দে দে, এ টাকায় দু জোড়া মুরগি হবে। এ—ত ডিম হবে। প্রাণ ভরে খাবি—বাড়তি ডিম বেঁচবি। সেই পয়সায় আবার হবে তোর ওই টিসা।

যমনার কাছে গিয়ে নোটখানি হাতে নিয়ে লাবেজের দিকে একবার তাকাল

পেস্তা ॥ (লাবেজকে) হ্যাঁ, তু মরদ আছিস। (যমনাকে) দিবে, দিবে—একদিন হামিও তোকে দিবে এমনি সব নোট। দশ টাকা হামার না ছিল—আজ হল। যাই আগে মাদারিহাট, কিনে আনি দু জোড়া মুরগি—ফুলপরী মুরগি—তোর মত। চলি—

যমনা ॥ দাঁড়া, মুরগি কিনবি হামার মত ?

পেস্তা ॥ হ্যাঁ রে যমনা, হ্যাঁ।

যমনা ॥ আর মোরগ ? তোর মত কিনবি তো, মুরগি ডিম না দেবে।

পেস্তা ॥ তু বড় ইয়ে—

পেস্তা ছুটে হাটে চলে গেল। লাবেজ ও যমনা খিল খিল করে হেসে উঠল

যমনা ॥ (হঠাৎ তার হাসি বন্ধ করে—চটে গিযে) তু হাসবি কেনে ? হামার স্বামী বোকা আছে, গরিব আছে, বুড়ো আছে, হামার আছে। তোর কি ? তু হাসবি কেনে ?

লাবেজ ॥ তু মিছে বলিস নি যমনা ভাবী, এটা হামার হাসবার কথা নয়, তোব জন্যে হামি হাসি না, কাঁদি।

যমনা ॥ তু ভাগ্। কাঁদবার কথা তোর নয। হামার গলার টিসা তোর বহুর গলায় দে, আজ তোর কাঁদবার কথা নয, দাঁত বের করে হাসবার কথা—ভাগ্।

লাবেজ ॥ ভাগবে না। টিসাটা ক্যানে হামি কিনলাম, তা তুই জানলি না। হামার মনেব মানুষটার গলায নিজ হাতে পরিয়ে দেবে, তাই না কিনলাম।

যমনা ॥ হামি জানি—তু বলবি, সে মানুষটা হামি।

লাবেজ ॥ হ্যাঁ, তু। তোকে একটা টিসা দিব—এ হামার অনেক কালের সাধ। গোটা বছর মেহনত করে তাই এই টাকা হামি জমালাম। এই নে তোর টিসা, তোকেই হামি দিলাম।

যমনা ॥ এ টিসা হামি গলায পরবে ?

লাবেজ ॥ পরবে না তো কি করবে! টিসা কি কেউ বাক্সে রাখে ?

যমনা ॥ বেশ, হামি গলায় পরবে—তোর দাদা যখন দেখবে তখন কি বলবে ?

লাবেজ ॥ না না, দাদা না দেখবে। বনে যাব মৌচাক থেকে মৌ ভাঙতে, তু যাবি হামার সঙ্গে ওই টিসা পরে। তু পরবি, খালি হামি দেখবে। দু আঁখ ভরে দেখবে।

যমনা ॥ তোর দাদা না দেখবে ?

লাবেজ ॥ না দেখবে। তুকে নিয়ে হামি পালাবে।

যমনা ॥ কুথা পালাবে ?

লাবেজ ॥ তোরসার উ পারে। উ বনে।

যমনা ॥ তু পাগলা হলি। বনে হাতী আছে, গণ্ডার আছে, বাঘ আছে—তু ভুলে গেলি !

লাবেজ ॥ ছোঃ ! গাছের মাথায় হামরা ঘর বাঁধবে।

যমনা ॥ দূর ! তু হাড়িয়া খেলি, তু মাতলা হলি—তু মরবি।

লাবেজ ॥ মরবে, হামি তুর জন্যে মরবে।

যমনা ॥ ভাগ্। তু মরদ না আছিস।

লাবেজ ॥ হামি মরদ না আছে ! তুই কুপিনীকে পুছ, হামি কি আছে।

যমনা ॥ (হেসে) হামি জানে—হামি জানে।

লাবেজ ॥ জানবে তো হামার সাথ চল্।

যমনা ॥ না, যাবে না। লোকটা কাঁদবে।

লাবেজ ॥ বুড়ার ভয়ে তু বুড়ী বনলি ! এ বুড়ী ! তোর বুড়া কুথা ? ছেলে-পেলে কুথা গেল ? নাতি-পুতি হল তুর ? বল্—বুড়ী, বল্।

লাবেজ হাসতে লাগল

যমনা ॥ এ ছোঁড়া! হামি বুড়ী—কি জোয়ানী—তু দেখবি ?

যমনা খিল খিল করে হেসে উঠল

লাবেজ ॥ তু অমন করে হাসছিস ক্যানে, বল্ যমনা, বল্, তু হাসছিস ক্যানে ?

যমনা ॥ তু কেমন মরদ আছিস হামি দেখবে। এ টিসা হামি হামার স্বামীর সামনে পরবে। বলবে—লাবেজ হামায় দিলে। দাও নিযে কাটতে যাবে হামার স্বামী তোকে, তখন তু কি বলবি, তাই হামি দেখবে, পরখ হবে, তু হামার না কার।

কথা বলতে বলতে যমনা টিসাটা নিজের গলায় পরে ফেলল—এমন সময় কুপিনী সেখানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল, কমলালেবুর শূন্য ঝুড়ি হাতে—

কুপিনী ॥ পালা—পালা—এখান থেকে পালা।

লাবেজ ॥ ক্যানে বে? পালাবে কেনে?

কুপিনী ॥ একটা বুনো হাতী গাঁযে সেঁধিয়েছে। হামরা পালালাম। ওই শোন্, গোলমাল এদিকে আসছে, (লাবেজের হাত ধরে টানতে টানতে) চল্—চল্।

লাবেজ ॥ (যমনাকে) তু চল্ যমনা।

যমনা ॥ হামি যাবে না।

লাবেজ ॥ ক্যানে যাবে না?

যমনা ॥ মরতে হয মববে, হামি যাবে না।

লাবেজ ॥ না—না—

যমনা ॥ তোবা পালা—তোদেব সব আছে—হামাব কি আছে।

কুপিনী ॥ (লাবেজকে) উ ভাবছে—ওব রূপ আছে। হাতীকে জাদু কববে. যেমন তুকে কবেছে। (চেঁচিযে) তু যাবি কি না বল্।

লাবেজ ॥ উকে ফেলে হামি না যাবে।

কুপিন ফুঁপিযে কেদে উঠল। অভিমানে অপমানে সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিযে গেল

লাবেজ ॥ তু মববি?

যমনা ॥ মববে। হামাব একটা ছেলে নাই, লোকে আমাকে বাঁজা বলে, মাগীগুলো হামাকে দেখে আব হাসে। ক্যানে হামি বাঁচবে?

লাবেজ ॥ (যমনাব কানেব কাছে মুখ নিযে চুপি চুপি) তু যা পাস নি, তু যা চাস, হামি তুকে দিবে।

লাবেজ যমনাকে চট্ করে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় তাদের সামনে এসে পড়ল পেস্তা টোটো। পেস্তা হেসে উঠল। লাবেজ যমনাকে মাটিতে নামিয়ে দিল। প্রথমটা সকলেরই একটু ইতস্তত: ভাব। ক্ষণপরে—

পেস্তা ॥ সাবাস লাবেজ। তু মবদ বটে।

লাবেজ ॥ বুনো হাতী গাঁয়ে সেঁধিযেছে, উ পালাবে না। জোব করে উকে তুলে নিলাম হামি।

পেস্তা ॥ হামার ভাবনা ছিল, উকে কে বাঁচাবে। ভাবলাম লাবেজ আছে, উ দেখবে।

লাবেজ ॥ তা তু এলি, এবার চল্, সবাই পালাই চল্।

পেস্তা ॥ (হেসে) কে পালাবে, হামরা ? ছুঃ ! সর্দার আর হামরা এমন আগ জ্বালালাম—বুনো হাতী দেখল আর পালাল—হামরা হেসে মরি।

লাবেজ ॥ বাঁচা গেল।

(প তোর বহু কোথায় ?

লাবেজ ॥ উ পালাল।

পেস্তা ॥ একা ?

লাবেজ মাথা নীচু করল

যমনা ॥ একা। উ হামার জন্ম রয়ে গেল।

পেস্তা ॥ বহুর চেয়ে ভাবী বড় হল ! (লাবেজকে) যা তু যা, বহুটা কোথায় গ্যাখ্—যা।

লাবেজ যাচ্ছিল

যমনা ॥ (লাবেজকে) দাঁড়া।

লাবেজ দাঁড়াল

যমনা ॥ টিসাটা লাবেজ হামাকে দিলে (পেস্তাকে গলার টিসাটা দেখাল)।

পেস্তা ॥ ভাল হল—ভাল হল—সারাটা পথ হামি কেবল তোর টিসাটার কথা ভাবলাম। ভাবলাম মুরগি হামার থাক্। টাকাটা লাবেজকে ফিরিয়ে দিয়ে টিসাটা ফিরিয়ে নেবে—তোর গলায় আবার পরিয়ে দেবে। তা টিসাটা ফেরত নিলি এবার টাকাটা ফেরত দি-ই—(ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে) নে লাবেজ, তোর টাকা নে।

যমনা ॥ নে লাবেজ, তোর টাকা নে।

লাবেজ ॥ টাকা হামি আর না নিবে।

বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল লাবেজের উপর পেস্তা

পেস্তা ॥ নিবি না—ক্যানে নিবি না ? উ তোর বহু আছে যে তু উকে টিসা দিবি ? নে ব্যাটা, টাকা নে।

যমনা খিল খিল করে হেসে উঠল

যমনা ॥ (লাবেজকে) হামি তোর কে আছে ?—বল্—বল্—

পেস্তা ॥ (বজ্র নির্ঘোষে লাবেজকে) বল্।

যমনা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। লাবেজ তার দিকে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল

যমনা ॥ (লাবেজকে) আরে, তু কেমন মরদ আছিস্—বল্।

লাবেজ ক্ষিপ্ত হয়ে যমনার গলা থেকে টিসাটি ছিনিয়ে নিল

লাবেজ ॥ হামি টাকা না নিবে—টিসাটা নিলাম। (যমনাকে) তু টাকা ধুয়ে জল খা।

লাবেজ চলে গেল। যমনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল

পেস্তা ॥ যমনা, তু কাঁদছিস ক্যানে ?

যমনা ॥ উ হামার টিসাটাই ছিনিয়ে নিলে। উ ক্যানে ছিনিয়ে নিয়ে গেল না হামাকে তোর ঘর থেকে !

পেস্তা ॥ বটে !

যমনা ॥ হ্যাঁ।

পেস্তা ॥ তার আগে হামার দাও ওর মাথাটা ছিনিয়ে নিত।···একটা ভুটানীকে হামি দেখেছি—যে উর বহু নিয়া ভাগল—তাকে উ ধরল—বুকে তার ছুরি মারল। হামরা দেখলাম।

যমনা ॥ বটে !

পেস্তা ॥ হ্যাঁ, লাবেজের রক্তে টোটোপাড়ার মাটি লালে লাল হবে তবে উ তোকে হামার কলিজা থেকে ছিনিয়া নেবে।

যমনা ॥ তোর মাথাটা গোলমাল হল—তু বোস্ (তাকে ধরে মাচার উপর বসিয়ে দিলে) হামি তামাকু আনি, তু মাথা ঠাণ্ডা কর্।

যমনা তামাক সেজে আনতে গেল। বাঁশের ঝুড়ি করার জন্য যমনার আনা একখানা দাও মাচার কাছে পড়ে ছিল, পেস্তা সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে তার ধার পরীক্ষা করতে লাগল।

লাবেজের স্ত্রী কুপিনী এল। কুপিনী পেস্তাকে দেখে চলে যাচ্ছিল

পেস্তা ॥ কুপিনী—

কুপিনী দাঁড়াল

পেস্তা ॥ শোন্—লেলাই এটা।

কুপিনী কাছে এল

পেস্তা ॥ লাবেজ কুথা ?

কুপিনী ॥ লাবেজ কুথা—তোরা বল্।

পেস্তা ॥ তোর মানুষ কুথা—হামরা বলবে !

কুপিনী ॥ তু না বলবে—তোর বহু বলবে। যমনা বলবে—ওই ডাইনী বলবে।

পেস্তা ॥ হামি বুঝি—কথাটা হামি বুঝি।

কুপিনী ॥ তু কচু বুঝিস। তু অন্ধ আছিস।

পেস্তা ॥ লাবেজকে হামি কাটবে—দাও দিয়ে কাটবে। ভুটিয়ারা যেমন কাটে দুশমনকে।

কুপিনী ॥ কাটবে ! কেন কাটবে ? তু তো ভুটিয়া না আছিস। মানুষ মারলে টোটোর ধরম যাবে—তু জানিস না ?

পেস্তা ॥ জানে—জানে—হামি জানে। আচ্ছা শুন্। তু কেমন বহু আছিস —মানুষটাকে তু ধরে রাখতে পারবি না !

কুপিনী ॥ তু কেমন মরদ আছিস—তোর বহুটাকে তু ধরে রাখতে পারবি না !

এমন সময় যমনা তামাক সেজে হুঁকো নিয়ে এল

কুপিনী ॥ (যমনাকে) বল্ ডাইনী, হামার লাবেজ কুথা ?

যমনা ॥ লাবেজ যদি তোর হবে—তু জানবি—হামি না জানবে।

কুপিনী ॥ সর্দারকে হামি আজ বলবে—ডাইনীটা মার—মার সর্দার—টোটোপাড়া তবেই টিকবে—না মারলে—টিকবে না—টিকবে না।

কুপিনী ছুটে চলে গেল। পেস্তা হুঁকোতে সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে হুঁকা রেখে দাওটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল

পেস্তা ॥ মারতে হবে ওই লাবেজটাকে—

যমনা ॥ মারবি ?

পেস্তা ॥ মারবে।

যমনা ॥ তু মারবি! তোর ধরম? ভর দুনিয়ায় তিন শো চোদ্দ টোটো আছে—এত কম আদমি হামাদের—দুনিয়ার সব লোক দ্যাখে আর হাসে—তাই টোটোর ধরম টোটোকে টোটো মারবে না। এটা ধরম আছে কিনা বল্।

পেস্তা ॥ ধরম। তাই আজও ওটা বাঁচি আছে।

যমনা ॥ ভর দুনিয়ায় তিনশ চোদ্দ টোটা আছে—দুনিয়ার সব লোক দ্যাখে আর হাসে, তাই টোটোর ধরম্, ছেলে না হবে তো টোটোর সাদি পাকা না হবে—টোটোমেয়ে পুরুষটা ছাড়িয়া দিবে—ভিন পুরুষ নিযে ঘর বাঁধবে—এও টেটোর ধরম আছে। আছে কিনা বল্।

পেস্তা ॥ আছে। তবে কি তু হামাকে ছাড়িয়া যাবে? চিমি আমাকে ছাড়িয়া গেল। ঘরে এলি তু। হামার পুজা তুকে হামি দিলাম—তু কেন যাবে?

যমনা ॥ চিমি ছেলে না পেল—চলে গেল। হামার কোল খালি আছে—হামি ছেলে চাই। হামি থাকবে কেনে?

পেস্তা ॥ শুন্—যমনা—শুন্।

যমনা ॥ না, হামি শুনবে না।

পেস্তা ॥ তিন তিনটা বছর একসাথ ঘর হল—বাঁচবার জন্য হামারা দুজন একসাথ কত লডাই করলাম—তোকে খুশী করতে কত না মেহনত করলাম! তু ফুল ভালবাসিস—জমিতে মারোয়া না বুনে ফুলের গাছ পুঁতলাম—সেই গাছে ফুল ফুটল।···তু যাবি?

যমনা ॥ যাবে। কি হবে ফুলে—যদি না হামার ঘরে ছেলের হাসি ফুটল!

পেস্তা ॥ ছেলে—ছেলে—ছেলে! (হতাশ হয়ে) যা তু চলে—হোক্ তোর ছেলে—বাড়ুক একটা টোটো—তু মা হ—তু সুখী হ—যা।

যমনা তার ঘরে চ'লে গেল। পেস্তা নীরবে হুঁকো টানতে লাগল। ক্ষণকাল পর —যমনা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, নিরাভরণা। আগের শাড়ি বদলে আর একটা মলিন শাড়ি পরে এসেছে সে। এক হাতে তার একটি ছোট পুঁটলি—তাতে তার গায়ের গয়নাগুলি, আর এক হাতে একটি কলের পুতুল—গ্যাটাপার্চারের। যমনা ধীরে ধীরে এসে পেস্তার পাশে দাঁড়াল

পেস্তা ॥ সেই পুতুলটা!

যম্‌না ॥ হ্যাঁ।

পেস্তা ॥ মাদারিহাট গেলাম—দোকানে দেখলাম ওই পুতুলটা—পেট টিপলে ট্যা-ট্যা করবে—এমনি উর কল। পরনের কাপড় না কিনে তিন টাকায় কিনলাম উটা তোর জন্যে। তু দেখে কি খুশী হলি! পুতুল নিয়েই ভুলে রইলি। হামি বললাম—উ পুতুলটা হামি ফেলে দেবে, ভেঙে ফেলবে। ভয় পেয়ে তু লুকালি। এমন লুকোন লুকালি খুঁজে হামি না পেলাম আর।

যমনা ॥ পুতুল নিয়ে তু থাক্‌। এ আর হামি চাই না। তিন-তিনটে বছর খেলনাতে হামি ভুললাম—গয়নাতে হামি ভুললাম—আর হামি ভুলবে না। এই নে তোর খেলনা—এই নে তোর গয়না।

যমনা পুতুলটা ও গয়নার পুঁটলিটি পেস্তার পাশে রেখে দিল।

যমনা ॥ হামি চললাম।

যমনা চলে যাচ্ছিল। এমন সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। যমনা দেখল তার সামনে এসে দাঁড়াল টোটোদের সর্দার, তার পশ্চাতে লাবেজ, তার পশ্চাতে কুপিনী। পেস্তা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল এবং অভিবাদন করল

পেস্তা ॥ সর্দার!

সর্দার ॥ বিচার হবে—আজ ভীষণ বিচার হবে—টোটো সব ছাড়বে—তার ধরম না ছাড়বে।

সর্দার মাচার ওপর গিয়ে বসল। সকলে হাত জোড় করে তার চুদিকে দাঁড়াল

সর্দার ॥ ভুটিয়া—নেপালী—সবাই বলবে সর্দার তো টোটো সর্দার—ভয়ে তার বাঘ-গরু এক সাথ জল খায়। বলবে কি না?

সকলে ॥ বলবে।

সর্দার ॥ টেটোব ধরম যদি যাবে কী থাকবে?

কুপিনী ॥ কিচ্ছু থাকবে না সর্দার, তু বিচার কর্—ওই ডাইনীর বিচার কর্।

সর্দার ॥ চুপ যা মাগী। কার বিচার হবে সে হামি জানে। পেস্তা, লাবেজ তোর ভাই লাগে?

পেস্তা ॥ লাগে সর্দার, লাগে।

সর্দার ॥ ভাই হয়ে ওই লাবেজ তোর বহুকে টানল—তোর ঘর ভাঙল—এ খবর তু রাখিস?

পেস্তা ॥ রাখি সর্দার, রাখি।

সর্দার ॥ (পেস্তাকে ভীষণ একটি চড় মেরে) তু কেমন মরদ আছিস রে শালা?

পেস্তা ॥ হামি কি করবে? টোটোর ধরম মানুষ না মারবে—হামি কি করবে?

সর্দার ॥ মানে তা হামি মানে। তা মানবে বলে দুশমনির সাজা না হবে?

লাবেজ ॥ কি দুশমনি হামার!

সর্দার ॥ সে জানে তোর বহু। উ নালিশ করলে তবে না হামি জানলাম। (কুপিনীকে) বল্ বহু, বল্।

কুপিনী ॥ দোষ করল ওই ডাইনী সর্দার। হামার মানুষটাকে জাদু করল—গুণ করল।

সর্দার ॥ চুপ যা মাগী। হামি যদি মরদ হই কোন্ শালী হামাকে জাদু করবে—গুণ করবে? দেওর হয়ে ভাবীর ঘরে সেঁধুল—তবে না উ মাগী এগিয়ে এল।

পেস্তা ॥ তু ঠিক বলেছিস সর্দার।

যমনা ॥ না সর্দার। (পেস্তাকে দেখিয়ে) উর ঘর হামি করবে না। তাই (লাবেজকে দেখিয়ে) উ হামার কাছে এল।

সর্দার ॥ না-না-না। আগে (পেস্তাকে দেখিয়ে) উ তোকে তালাক দেবে—তবে (লাবেজকে দেখিয়ে) উ আসবে। আগে কেন আসবে ?

যমনা ॥ উ হামাকে তালাক দিছে।

সর্দার ॥ কবে দিছে ?

যমনা ॥ এখন দিল।

সর্দার ॥ তবে ? আগে লাবেজ পেস্তার ঘর ভাঙল, তবে পেস্তা তুকে তালাক দিল। টোটার ধরম বলে, সব পাপের মাপ আছে—ঘর-ভাঙার মাপ না আছে। লাবেজ ! লেলাই-এটা।

লাবেজ কাছে এসে দাঁড়াল

সর্দার ॥ (লাবেজকে) হামি কে বল্ ?

লাবেজ ॥ টোটোর সর্দার।

সর্দার ॥ কে হামাকে তোদের সর্দার করল ?

লাবেজ ॥ ইসফা—টোটোর দেবতা।

সর্দার ॥ হামার কাজ ?

লাবেজ ॥ বিচার !

সর্দার ॥ (ইসফার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে) দোহাই ইসফা—দোষ না নেবে। হামার বিচারে লাবেজ দুশমন—দোষী। হামি উকে সাজা দেবে। দোহাই ইসফা দোষ না নেবে। (সকলের প্রতি) বিচার হল, লাবেজ এ-গাঁয়ে আর না থাকবে। উ আর টোটো না আছে। এখনি উকে যেতে হবে, টোটোপাড়া জন্মের মত ছাড়ি, তোরসার ওপারে ওই বনে।

সকলে আর্তনাদ করে উঠল

যমনা ॥ সূর্য্যটা ডুবছে। সব আঁধার হয়ে আসছে।

কুপিনী ॥ তোরসাতে বান—সর্দার, দয়া কর—দয়া কর—

যমনা ॥ বনে বাঘ আছে—গণ্ডার আছে—বুনো হাতী আছে—এই রাতে বনে সেঁধুলে উ বাঁচবে না—উ মরবে সর্দার—উ মরবে।

সর্দার ॥ ইসফার ইচ্ছা—হামি কি করবে ?

কুপিনী ॥ না—না। ইসফার ইচ্ছা উ বাঁচবে—হামার পেটে উর ছেলে আছে—দুদিন বাদে যখন ছেলে হবে—তাকে কে খাওয়াবে? তার খাবার জোটাবে কে? ছেলেটাকে মানুষ করবে কে—হামার স্বামী যদি না বাঁচে ?

সর্দার ॥ বটে।

কুপিনী ॥ হ্যাঁ, সর্দার। হামি তোদের কাছে কি দোষ করলাম—হামার ছেলেটা বাঁচবে না। এ তোর কি বিচার সর্দার ?

যমনা ॥ একটা ছেলে—একটা ছেলে—হামি পাই নি, উ পেয়েছে—উ পেটে ধরেছে—ছেলেটা বাঁচুক সর্দার।

সর্দার ॥ বাঁচবে—ইসফার ইচ্ছা—টোটোর বাচ্ছা বাঁচবে। তিন শো চৌদ্দ টোটো ইসফার কাছে কাঁদে আর বলে—বাড়াও, হামাদের বাড়াও। একটা বাচ্ছা যখন উর পেটে টোটোপাড়ায় আসছে—আসুক—বাঁচুক। লাবেজ, তু খালাস।

সকলে ॥ জয় সর্দার জয় ! জয় ইসফার জয় !

সর্দার ॥ থাম্ তোরা। ঘর ভাঙার বিচার হতেই হবে। এ বিচার না হবে তো ইসফা মাপ না করবে। সব টোটোর ঘর চুরমার হবে।—যমনা, লেলাই এটা। (যমনা কাছে এল) তু কুপিনীর ঘর ভেঙেছিস। ইসফার ইচ্ছা—হামার হুকুম—তু এ গাঁয়ে আর না থাকবে। তু আর টোটো না আছিস। এখুনি তুকে যেতে হবে জন্মের মত টোটোপাড়া ছাড়ি—তোরসার উ পারে ওই বনে। (পেস্তা ও লাবেজের আর্তনাদ অগ্রাহ্য করে, লাবেজ ও

কুপিনীর প্রতি) চল্, তোদের ঘরে হামি যাবে—তোদের বাচ্ছাটার যাতে ভাল হয় ইসফার সেই মন্তর হামি এখনি পড়বে।

সর্দার এক হাতে লাবেজ আর এক হাতে কুপিনীকে ধরে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সর্দার ঘুরে দাঁড়িয়ে যমনা ও পেস্তার উদ্দেশ্যে বললে—

সর্দার ॥ হামি এখনি এখানে ফিরবে—হামি তখন কি দেখবে ?

যমনা ॥ যমনাকে না দেখবে সর্দার।

সর্দার ॥ ব্যস্!

কুপিনী ও লাবেজ সহ সর্দারের প্রস্থান

যমনা ॥ এ হামার সাজা না আছে—হামি চলি।

পেস্তা কোন কথা বলতে পারে না—ফ্যাল ফ্যাল করে যমনার দিকে চেয়ে থাকে

যমনা ॥ একটা জিনিস যাবার আগে যমনা তোর নিবে। (পুতুলটি তুলে নিয়ে)—ই-টা। (পুতুলটির পেট টিপতে পুতুলটি প্যাঁক করে উঠল। যমনা খিল খিল করে হেসে উঠল। পেস্তার দিকে তাকিয়ে পাগলীর মত হেসে) এই তোর ছেলে—এই ছেলে তু হামাকে দিলি। একেই নিয়ে হামি চললাম।

যমনা ছুটে বেরিয়ে গেল। পেস্তা দাঁড়িয়ে দেখল—কি ভাবল—হঠাৎ তার ঘরে গেল। ক্ষণপর কুপিনী ও লাবেজ সহ সর্দার ফিরে এল

সর্দার ॥ যমনাটা গেল। পেস্তাটা কাঁদবে। পেস্তা! (কোন সাড়া না পেয়ে সর্দার আবার ডাকল) পেস্তা! (লাবেজ ও কুপিনীর প্রতি) তোরা ঘরটা দ্যাখ্।

লাবেজ ও কুপিনী ছুটল

সর্দার ॥ যমনাকে যেতে হামরা দেখলাম। পেস্তা কুথা গেল ?

কুপিনী পেস্তার ঘর দেখে আবার এখানে ছুটে এল

কুপিনী ॥ উ তো ঘরে নেই। উর ঘরে আগুন জ্বলছে।

লাবেজের প্রবেশ

লাবেজ ॥ হ্যাঁ সর্দার, ঘরে আগুন দিয়ে পেস্তা ফেরার।

কুপিনী ॥ ওই ডাইনীটার পেছু নিয়েছে সর্দার।

সর্দার ॥ তবে উটাও গেল—আ-হা-হা, টোটোর একটা ঘর ভাঙি গেল—পুড়ি গেল। লাবেজ! লাবেজ! আগুনে জল ঢাল্। আর যেন একটা ঘর না ভাঙে—না পোড়ে। চল্—চল্—ছুটে চল্।

আগুন নেভাতে সকলে ছুটল

॥ যবনিকা ॥

"শনিবারের চিঠি" মাসিক পত্রিকার ১৩৬৩ সনের কার্তিক সংখ্যায় এই নাটিকাটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন প্রথম খণ্ড ছিল না। দ্বিতীয় খণ্ডই নাটিকাটির সামগ্রিক রূপ ছিল এবং উহা কলিকাতার অপেশাদার নাট্যপ্রতিষ্ঠান "লোকমঞ্চ" রাইটার্স বিল্ডিংস ক্যানটিন হলে গত ১৯৫৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর প্রথম মঞ্চস্থ করেন। নাটিকাটি বর্দ্ধনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করায়, পরে, প্রথম খণ্ড অন্তর্ভুক্ত অংশ সংযোজিত হয়। "ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজাবাজার শাখা" তাহাদের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে, রঙমহল রঙ্গমঞ্চে, ১৯৫৮ সালের ২৮শে জুলাই, এই গ্রন্থে প্রকাশিত সম্পূর্ণ নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

সাংঘাতিক লোক

প্রৌঢ় ধনঞ্জয় বসু লক্ষপতি ব্যবসায়ী, নিঃসন্তান। গৃহিণী কমলা সন্তান-হীনতার ব্যথায় ব্যথিতা। ধনঞ্জয় বসুর কক্ষ। সন্ধ্যারাত্রি। ধনঞ্জয় ও কমলা।

ধনঞ্জয় ॥ দার্জিলিং চল—

কমলা ॥ না।

ধনঞ্জয় ॥ তবে শিলং—

কমলা ॥ না।

ধনঞ্জয় ॥ পুজোর ছুটিটা কি এবার তবে এই কলকাতাতেই কাটবে? পচে মরবে যে—!

কমলা ॥ মরলে বাঁচতুম! শোন—এবার কোন তীর্থে চল—

ধনঞ্জয় ॥ কোন তীর্থ যে তোমার বাদ রয়েছে মনে হচ্ছে না তো কমলা?

কমলা ॥ এবার আমি হরিদ্বার যাবো।

ধনঞ্জয় ॥ এবার নিয়ে হরিদ্বার তবে কবার হবে কমলা?

কমলা ॥ সেদিন বকুলমালা এসে বলে গেল, সেখানে নাকি কোন্ সাধু আছেন—

ধনঞ্জয় ॥ যিনি আমায় দেবেন এক চরু—আমি তোমায় দেব তা খেতে এবং তুমি তা খেয়েই রাতারাতি মা হয়ে যাবে—নাকি?

কমলা ॥ তোমার বিশ্বাস নেই বলেই তো···হয় না। নইলে···এমন তো কত দেখলুম মন্ত্রে তন্ত্রে তাবিজ কবজে—হয়েছে তো।

ধনঞ্জয় ॥ কেমন করে যে কি হ'ল···কে তা দেখতে যাচ্ছে।

কমলা ॥ আবার ঠাট্টা! ভারী অন্যায় কিন্তু।

ধনঞ্জয় ॥ তা বেশ তো, হরিদ্বারেই যাবে। ব্যবস্থা কচ্ছি--

কমলা ॥ কবে যাচ্ছো?

ধনঞ্জয় ॥ আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না—! দার্জিলিং শিলং—ওদিকটায় এই ছুটিতে আমায় যেতেই হবে—খানকতক বাড়ী করে ভাড়া দিলে চলে বেশ! তাই একটু ঘুরে দেখে আসতে হচ্ছে। তা ছাড়া, এবার কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়েছি, হাতে অনেক কাজ। এসেমব্লির মেম্বার হবারও একটা সুযোগ এসেছে। কি করে যাই? তা তুমি একা গেলেই তো চলবে। মা—তো আমি হচ্ছিনা, হবে তুমি।

কমলা ॥ ভাল হচ্ছেনা বলছি!···তুমি না গেলে নাকি হয!

ধনঞ্জয় ॥ আজ বার বছরই তো সঙ্গে ছিলুম—সঙ্গে গেছি—একবার না গেলে হয়তো ফল হ'তে পারে।

কমলা ॥ তোমার সঙ্গে কথা কইলেও পাপ। কি দেখে বাপ মা যে আমায় তোমার হাতে দিয়েছিলেন জানি না।

ধনঞ্জয় ॥ কে যে তাতে ঠকেছে বুঝছিনা!

কমলা ॥ বটে! টাকার গরবেই মেতে আছ, না? কিন্তু এ টাকা ভোগ করবে কে? কার জন্য এই ছাই জম্‌ছে?

ধনঞ্জয় ॥ সে আমি জানিনে। পুরুষ মানুষ—টাকা রোজগার করতে হয়, করে যাচ্ছি—না করলে অপৌরুষ হত!

কমলা ॥ কি আমার পৌরুষ রে!

বেয়ারা কার্ড লইয়া আসিল

ধনঞ্জয় ॥ (কার্ড দেখিয়া) এখন দেখা হবেনা। (বেয়ারা চলিয়া গেল)

কমলা ॥ কে?

ধনঞ্জয় ॥ কে এক সোমেশ সরকার।

কমলা ॥ সেমেশ সরকার! কে এই লোকটা? প্রায়ই সন্ধ্যার সময় এসে কার্ড পাঠায়। অনেকদিন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঘুরচে।

ধনঞ্জয় ॥ কোন চাকুরীর উমেদার হয় তো!...তা হ'লে তুমি হরিদ্বার যাচ্ছ?

কমলা ॥ যাচ্ছি এবং তুমিও।

ধনঞ্জয় ॥ তা হলে তোমার আর কিছু হ'ল না। জানতো এ বিষয়ে আমি কি অপয়া! এই বার বছর তো দেখলে।

কমলা ॥ যা খুসী তাই বলছ, না?

বেয়ারার পুনঃপ্রবেশ

বেয়ারা ॥ ও আদমি তো নেহি যাতা হ্যায়। বহুৎ হল্লা সুরু কিয়া।

ধনঞ্জয় ॥ উস্কো নিকাল দেও—

কিন্তু...এক অসম্ভব ব্যাপার ঘটিল। সোমেশ সরকার চাকর-বাকরদের হটাইয়া ঘরে আসিয়া উপস্থিত

কমলা ॥ কি সর্বনাশ!

ধনঞ্জয় ॥ কে এই বেয়াক্কেল? খুনে না ডাকাত?

সোমেশ ॥ (২০।২২ বৎসরের যুবক। সুগঠিত দেহ। দেখিলে তুচ্ছ করা চলেনা। ধীর ভাবে উত্তর দিল) আপনি আমায় চিনতে পারছেন না, কিন্তু আপনি আমার মাকে চিনতেন। দেখুন তো—(বলিয়াই বুক পকেট হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া ধনঞ্জয়ের সম্মুখে ধরিল)

ধনঞ্জয় ॥ (মুহূর্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক ওদিক চাহিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে)—হ্যাঁ চিনি বলেই তো মনে হচ্ছে। মোহিনী না? হ্যাঁ, মোহিনীই তো।...এ্যাঁ, তুমি মোহিনীর ছেলে? এত বড়টি হয়েছ? (স্ত্রীকে) কমলা শীগ্‌গির চা জল খাবার আনো। আমাদের মোহিনীর ছেলে!

চাকর বাকর চলিয়া গেল

সোমেশ ॥ আপনি ভুল করছেন। মার নাম তো মোহিনী নয়--

ধনঞ্জয় ॥ তুমি আর কি জান হে ছোকরা, তুমি তখনো হওনি, ঐ নামেই আমরা তাকে—ডাকতুম ?—কমলা, চা—চা—

কমলা ॥ কে মোহিনী ?

ধনঞ্জয় ॥ আমার এক বিশেষ বন্ধুর মেয়ে—চা নিয়ে এস শুনবে এখন—

কমলার প্রস্থান

সোমেশ ॥ আপনি মিথ্যা বললেন—

ধনঞ্জয় ॥ না বলে আমার উপায় ছিলনা। (দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিযা) উনি আমার স্ত্রী, মনে রেখো। তুমি বিরজার ছেলে ?

সোমেশ ॥ আজ্ঞে হাঁ।

ধনঞ্জয় ॥ সে কি এখনও বেঁচে আছে ?

সোমেশ ॥ আজ ছ'মাস হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যেই আমি সন্ধান পেযেছি যে আমি পিতৃহীন নই।

ধনঞ্জয় ॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও। বিরজার ছেলে হয়েছিল আমি জানি। কিন্তু সে যে তুমি—তার কি প্রমাণ তোমার আছে ?

সোমেশ ॥ ফটো আছে—আমাকে কোলে নিযে মার বুকে মাথা রেখে আপনি বসে আছেন। আপনাব ছিল ক্যামেরা—কোন ফটো তুলতেই আপনি বাকী রাখেন নি। মাও ছিলেন বুদ্ধিমতী। আজ আমায় যে প্রশ্ন আপনি করছেন—সেই প্রশ্ন কোনদিন উঠ্‌তে পারে ভেবে তিনিও সযত্নে সব ফটোই লুকিয়ে রেখেছিলেন—আপনার বহু চিঠি—আমি ভালো আছি কিনা, আমার সর্দি জ্বর সারছে না কেন—আমি এত কাঁদি কেন—এমনি সব উদ্বিগ্ন প্রশ্নে আপনার প্রত্যেক চিঠি ভরপুব থাকতো। মাকে আপনি সত্য সত্যই তখন ভালোবাসতেন—কাজেই ভবিষ্যতের ভয় তখন আপনার ছিলনা।

ধনঞ্জয় ॥ তুমি কি চাও ?

সোমেশ ॥ আমি আপনার পুত্ররূপে আপনার সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে চাই। আমার ন্যায্য অধিকার আমি চাই।

ধনঞ্জয় ॥ কিন্তু তোমার মা আমার বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না।

সোমেশ ॥ নাইবা থাকলেন।

ধনঞ্জয় ॥ বিরজা কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে এমন কোন দাবী কোনদিন করেনি—এমন কি সে তোমার খোরপোষের দাবীও করেনি—

সোমেশ ॥ তার কারণ তিনি আপনাকে সত্যিই ভালবাসতেন। সেটা আপনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই, সহজেই ঐ কুমারী মেয়েকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন—তাঁর সর্বনাশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু,—অভিমান ছিল তাঁর অতিশয় বেশী। আপনার ভালোবাসাই তিনি যখন হারালেন—টাকা চেয়ে অধিকতর অপমানিতা হতে তিনি চাননি।

ধনঞ্জয় ॥ তারি ছেলে হযে তুমি—

সোমেশ ॥ আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি শুধু তার একার ছেলে নয়, আপনারো। অর্থে আপনার দুর্দান্ত লোভ—সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করবার জন্যে আপনার অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা। যশের কাঙ্গাল আপনি···। আপনার এই সদ্‌গুণগুলি আমার রক্তেও আছে—

ধনঞ্জয় ॥ আমার স্ত্রীর আসবার সময় হয়েছে—তুমি আজ চলে যাও। অথবা চুপ করে চা খেযে চলে যাও। পরে একদিন বরং আমি তোমাকে খবর পাঠাবো—। অনেক কিছু ভাবনার—অনেক কিছু বিবেচনা করবার আছে।

সোমেশ ॥ কিন্তু কোথায় আমি যাব? অর্থহীন সম্বলহীন বেকার যুবক আমি। সে যে কি দুঃখ আপনি তা ধারণা করতে পারেন না বলেই আমায় চলে যেতে বলছেন। চায়ের কথা বললেন—ঐ চা আমি কদ্দিন খাইনি, জানেন?

ধনঞ্জয় ॥ না—না তুমি চা খেয়েই যাও। কিন্তু আমার স্ত্রীর সামনে আমার কোন কথার প্রতিবাদ করোনা, বুঝলে?

সোমেশ ॥ অনেক কিছু মিথ্যা বলে যাবেন আপনি—না?

ধনঞ্জয় ॥ তা না বলে উপায় কি? তুমি বরং আজ তাহলে চলেই যাও—আমি কিছু টাকা দিচ্ছি—কত চাও?

সোমেশ ॥ দু-দশ টাকা আমি চাইছি না।

ধনঞ্জয় ॥ না-না, দু'দশ টাকা কেন? সেই ফটো আর চিঠিগুলো আমায় তুমি ফেরত দাও—দশ হাজার টাকা আমি তোমায় দেব—

সোমেশ ॥ না।

ধনঞ্জয় ॥ বেশ, পনর হাজার। না তার বেশী আর আমি উঠতে পারিনা।—ঐ আমার স্ত্রী আসছেন···তুমি চলে যাও—চলে যাও!

সোমেশ ॥ আমি যেতে আসিনি—আমি থাকতেই এসেছিলাম। এই আপনার চিঠির তাড়া—নমস্কার— **প্রস্থানোদ্যত**

ধনঞ্জয় ॥ পনর হাজারের একখানা চেক দিচ্ছি।

সোমেশ ॥ মাপ করবেন, টাকার জন্য আমি আসিনি—আপনার স্নেহের জন্য এসেছিলাম।···সে স্নেহ যখন পেলাম না—টাকা আমি চাই না। আমি আমার মায়েরই ছেলে—ভুলবেন না।

দরজা খুলিয়া ঝড়ের মত প্রস্থান। খাবারের থালা হাতে কমলার প্রবেশ

কমলা ॥ কী মানুষ গো! ঝড়ের মতো চলে গেল যে? দোর বন্ধ করে—তোমরা কি বলছিলে বলত?

ধনঞ্জয় ॥ (সামলাইয়া লইয়া) ইংরেজীতে যাকে বলে ব্ল্যাক্‌মেলার। সাংঘাতিক লোক—। না পারে এমন কাজ নেই। ও চা ফেলে দাও। ওখান থেকে ই-আই-আরএর টাইম টেবলটা দাও দেখি—হরিদ্বারের ট্রেন কখন ছাড়ছে—দেখছি।

॥ যবনিকা ॥

দীপালি—পূজা সংখ্যা ১৩৪৫

মাসতুতো ভাইরা

সুষুপ্ত কলিকাতা

রাত্রি প্রায় দুটো

অন্ধকার শয়নকক্ষে মাঝে মাঝে খুট খুট শব্দ। হঠাৎ সুইচ টেপার শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্-টিক আলো জ্বলে উঠল। সুইচের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভদ্রলোক দেখতে পেলেন একটি মজুর শ্রেণীর লোক একটি বড় ট্রাঙ্কের তালা খুলেছে- হাতে তার যন্ত্রপাতি

ভদ্রলোক॥ ভাগ্যিস ঘুমটা ভেঙেছিল।···কিন্তু ঢুকলে কি করে তাই ভাবছি।···ও, জানলার গরাদে বেকিয়ে—

···বাহাদুর বটে। না না নড়ো না। রিভলবারটা নিয়েই আমি শুই। এটা যদি আমার হাতে না থাকতো, তবে আরো খানিকটা দুঃসাহস তুমি দেখাতে পারতে। কিন্তু (রিভলবার তার দিকে লক্ষ্য করে) হাত তোল—

লোকটি॥ (বুঝল উপায় নেই। সে দু হাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পণ করল)

ভদ্রলোক॥ পাইপ বেয়ে দোতালা উঠে জানালার গরাদে বেকিয়ে—ডেঞ্জারাস! ···দরকার হলে হয়ত খুনও কর্তে—কি বল?

লোকটি॥ দেখুন—সংসার চলে না—পেট ভরে খেতে পাইনে তাই, নইলে প্রাণ হাতে করে কে এসব কাজে আসে। আমায় মাপ করুন স্যার। আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

ভদ্রলোক॥ দিব্যি হাত পা রয়েছে। খেটে খেতে কি হয়? তোমরা মুটে মজুর—এখন তো তোমাদেরই পোয়া বার। মজুরি তো বেড়েই চলেছে। তবু এসব কেন?

লোকটি॥ আজ্ঞে, ষ্ট্রাইক আর লক-আউটে যে মারা যাচ্ছি, পূর্ববঙ্গ থেকে একপাল গুষ্টি কুটুম্ব ঘাড়ে চেপেছে—তাদের মুখেও দুটি অন্ন দিতে হয়।···নেহাৎ চলে না বলেই—

ভদ্রলোক ॥ আমার ওপর ভর করেছ। কিন্তু কলকাতা সহরে এত লোক থাকতে আমার ওপর নেক নজর কেন বাবা? বিয়ে থা করিনি—একা থাকি—আজ কলকাতা—কাল দিল্লী—রোজগারের ধান্ধায় ঘুরছি—আমার ঘরটি বেছে নিলে কেন?

লোকটি ॥ আজ্ঞে দাবোয়ানের কাছে খবর নিয়ে জেনেছিলাম—মাসের মধ্যে বিশ দিনই আপনি স্যার বাইরে থাকেন। এঘর খালি পড়ে থাকে—তাই।

ভদ্রলোক ॥ হুঁ।...কিন্তু আমি একা লোক। স্ত্রী নেই যে সোনাদানা থাকবে। টাকাকড়ি যদিও বা থাকে, ব্যাঙ্কেই আছে। কি আশায় তুমি এমন দুঃসাহস—

লোকটি ॥ শালা দারোয়ান গল্প করে স্যার, ব্যাঙ্কে আপনি টাকা রাখেন না। শালা বলে আপনার সব চোরাকারবার। ঐ শালা আমায় ফাঁসিয়েছে স্যার। আমায় এবারটির মতো মাপ করুন—জেলে দিলে দশ দশটা মুখ—অনাহারে মারা যাবে।

ভদ্রলোক ॥ তোমার কথা শুনে কষ্ট হচ্ছে। যাও—এবারকার মতো তোমায় মাপ করলুম। কিন্তু খবরদার এ সব পথে আর এসো না। দাঁড়াও। এই দশটা টাকা নিয়ে যাও। তোমার কথা শুনে সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছে। খাবার কষ্ট—বড় কষ্ট। যাও—না না পায়ের ধুলো নিতে হবে না। না না, এদিক দিয়ে গেলে কারো না কারো কাছে তুমি ধরা পড়বে। তুমি যেমন এসেছিলে—তেমনি নেমে যাও।

লোকটি বাতায়ন পথে নেমে গেল। ভদ্রলোক বাতায়নটি বন্ধ করে দিলেন। হাতঘড়িটি দেখলেন। তারপর একগোছা চাবি বের করে কয়েকটা ট্রাঙ্ক ও আলমারী খুলে কিছু টাকাকড়ি এবং মূল্যবান জিনিস একটা এটাচিকেসে ভরলেন।

বাইরে কার পদশব্দ পাওয়া গেল। ভদ্রলোক বাতিটি 'সুইচ অফ্' করে নিভিয়ে দিলেন। তারপর ল্যাচ-কি-যোগে বাহির থেকে কে একজন ঘরে এলেন—এবং তিনি আবার বাতি জ্বাললেন। নবাগত দেখলেন জিনিসপত্র সব ছড়ানো। স্পষ্ট বুঝলেন—ঘরে কোন একটা কাণ্ড ঘটেছে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন—এমন সময় বাথরুম থেকে প্রথমোক্ত ভদ্রলোক সপ্রতিভভাবে বেরিয়ে এলেন

নবাগত ॥ আরে! একি! রণেন যে!

ভদ্রলোক (রণেন) ॥ আর বল কেন! পেটের দায়ে। কিন্তু তোমার তো আজ রাতে ফেরবার কথা ছিল না বীরেন।

বীরেন ॥ তা ছিল না বটে। কিন্তু আমার ঘরে তুমি এত রাতে ঢুকলে কি করে—আর এসব কি ব্যাপার ?

রণেন ॥ এক কথায় বলেছি তো, পেটের দায়। চোখের ওপর দেখছিলাম ইউনিভার্সিটির দরজা না মাড়িয়েও চোরাবাজারে তুমি অঢেল টাকা কামাই করছ—আর আমি বি. এ.—এম. এ. পাশ করেও সাংসারিক পরীক্ষায় ফেল! এ বাজারে দেড়শো টাকা মাইনেতে বাড়ী-শুদ্ধ লোক আধপেটা খেয়ে মরছি। তাই—

বীরেন ॥ ছাখ রণেন! তুমি আমার ছোট বেলার বন্ধু, তাই এখনো তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার অবকাশ পাচ্ছ। কিন্তু চোরা-বাজারের সঙ্গে আমায় তুমি জড়াবে আর আমি তোমায় ক্ষমা করব—এ আশা তুমি ক'রো না। টাকা রোজগার করা মানেই চোরা-বাজার নয়।

রণেন ॥ টাকা রোজগার করা মানেই যে চোরাবাজার নয় তা জানি। কিন্তু তোমার রোজগার যে চোরাবাজারে, তার দলিলপত্র আমি আজ এখানেই কিছু পেয়েছি কিনা। এই ধরো বুলাকিদাসের সঙ্গে তোমার কারবারটা।

রণেন পকেটে হাত দিয়ে দলিলটা বের করতে গিয়ে কাগজপত্রের সঙ্গে রিভলভারটা বেরিয়ে এল। সে রিভলভারটা সামনে রেখে—একটা টাইপ করা চিঠি বীরেনের সামনে ধরল

রণেন ॥ এই যে চুক্তিটা, এটা কি ধর্মবাজারের চুক্তি ?

বীরেন ॥ তুমি আমার কাগজপত্রই শুধু চুরি করনি, রিভলভারটাও—

রণেন ॥ হ্যাঁ ভাই। তাই এতক্ষণও তুমি আমার ওপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়নি। সে যাক্। আমি এখন কি করবো শোন। আমি তোমার

টাকাপয়সা কিচ্ছু ছোঁব না। টাকাপয়সা তোমার যেমন ছিল তেমনি রইল।…ও, হ্যাঁ দশটা টাকা আমি আমার আর এক ভাইকে দেবার জন্য নিয়েছি এই যা। কিন্তু তোমার এই কাগজপত্রগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। এগুলো এনফোর্সমেণ্টে দাখিল করে ওদের ওখানে একটা ভাল চাকুরি পাব—এই আশায়। দেশেরও কাজ হবে—পরিবার শুদ্ধ আমিও দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচব।

বীরেন ॥ টাকা তোমার যা লাগে আমি—আমি দিচ্ছি রণেন।

রণেন ॥ না ভাই মাপ করো। তোমাদের মতো এইসব হঠাৎ বড়লোকদের আমি একেবারেই সইতে পারি না। তোমাদের মটর কাদা ছিটিয়ে বহুদিন আমার কাপড় নোংরা করেছে। তোমাদের মটর—তোমাদের—যাদের কোন গুণ নেই—কোন বিদ্যা নেই—শুধু দেশের সর্বনাশ করে টাকা রোজগারের ফন্দী ফিকির আছে। আর দুদিন বাদে—লোকে তোমাদের গুলী করে মারবে। এই সৎসাহসটা—এই দায়িত্ববোধটা আজো আমাদের হয়নি বলেই, আজ তুমি বেঁচে গেলে। আসি ভাই। মনে কিছু ক'রো না।

রণেন চলে গেল। বীরেন চেঁচামিচি করতে গিয়ে, নিজের বিপদ হবে বুঝে হঠাৎ থেমে গেল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

যবনিকা

পরাগ
শারদীয়া সংখ্যা
১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ :
হোমশিখা
আশ্বিন
১৩৬২

রফা

প্রাণধন বসুর বসিবার ঘর। প্রাণধনের বিবাহযোগ্যা অরক্ষণীয়া কন্যা সুনয়নীকে আজ পাত্রপক্ষ দেখিতে আসিতেছেন। প্রাণধনের পুত্র কৃষ্ণধন ছুটিয়া আসিল। প্রাণধন হুঁকা টানিতেছিল।

কৃষ্ণধন ॥ (স্বগত) হাড় কেপ্পণ বুড়ো—এইবার মরো! (প্রকাশ্যে) এতো ক'রে আমি তোমায় বললাম বাবা—দশটা টাকা দাও, আমি দিনে দিনে গিয়ে ওদের ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে আসি—তা দিলে না, এখন বোঝো ঠেলা, পাত্রপক্ষ আসতে আসতে, সেই রাত্তিরই হ'ল।

প্রাণধন ॥ (স্বগত) ব্যাটাচ্ছেলে তোমায় আমি চিনি না—খালি মারবার ফন্দি! (প্রকাশ্যে) রাত হ'ল তো কি হ'ল?

কৃষ্ণধন ॥ (স্বগত) বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো। (প্রকাশ্যে) মেয়ে যে তোমার রাতকাণা সে খেয়াল আছে? কাণা কড়ি দিয়ে কেমন ক'রে কাণা মেয়ে পার করো আমি দেখব! ঐ ওরা আসছে—

প্রাণধন ॥ (স্বগত) বেটা তো নয়, ঘর শত্রু বিভীষণ! (প্রকাশ্যে) শোন্ বাবা, মেয়ে আমার, কিন্তু তোরও তো বোন। তার ওপর মেয়েটার মা নেই। যেমন ক'রে হ'ক পার ক'রতেই হবে বাবা। ঐ ওদের পায়ের শব্দ পাচ্ছি। তুই খুকীকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে আয়। আর বুঝলি, চা-জলখাবারটা অল্পের মধ্যেই একটু জাঁকিয়ে—মানে মাসের শেষ কিনা!

কৃষ্ণধন ॥ (স্বগত) মাস পয়লাতেও তুমি ব'লে থাকো মাসের শেষ। জীবনটা তোমার কবে শেষ হবে বাবা! (প্রকাশ্যে) যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। ঐ ওঁরা এলেন, তুমি ছাখো!

কৃষ্ণধনের অন্দরে প্রস্থান। পাত্রপক্ষীয় তিনজনের প্রবেশ—পাত্র স্বয়ং চন্দ্রবদন চৌধুরী—তাহার মাতুল রাখোহরি—এবং পাত্রের বন্ধু পদ্মলোচন।

প্রাণধন ॥ (স্বগত) ওরে বাবা এ যে একেবারে ত্রিশূল! (প্রকাশ্যে) আসুন, আসুন। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য রাখোহরিবাবু।

রাখোহরি ॥ (স্বগত) অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। (প্রকাশ্যে) আমাদেরই কি কম সৌভাগ্য প্রাণধন বাবু! কুটুম্বিতা হওয়া না হওয়া সে হ'ল গিয়ে হরির ইচ্ছা! কিন্তু আপনার মতন মহাজনের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, এ কি কম কথা।

প্রাণধন ॥ (স্বগত) উক্তির বহরটা বড্ড বেশি—যেন চোরের ওপর বাটপারি! (প্রকাশ্যে) আমারও সেই কথা রাখোহরি বাবু। আলাপ-পরিচয়টাই কি কম সৌভাগ্য! কিন্তু এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না তো!

রাখোহরি ॥ (স্বগত) শালা সব বুঝেও ন্যাকা সাজ্‌ছে। (প্রকাশ্যে) এই যা! তাই তো! এ হ'ল গিয়ে পদ্মলোচন—আর এ হ'ল গিয়ে চন্দ্রবদন—মাস্‌তুতো ভাই দুটি—দু-জনেই আমার ভাগ্নে।

প্রাণধন ॥ (স্বগত) শালারা জানে নামের ওপর কোন ট্যাক্স নেই! (প্রকাশ্যে) বেশ, বেশ! কিন্তু মূলধন কোনটি?

রাখোহরি ॥ (স্বগত) মূলধন সঙ্গেই এনেছি। কিন্তু সুদের হার চড়া হ'লে চক্ষু চড়ক গাছ যেন না হয়, প্রাণধন! (প্রকাশ্যে) এই তো চন্দ্রবদন—(চন্দ্রবদনকে) প্রণাম করোনি? সে কি বাবা! প্রণাম করো। বুঝলেন প্রাণধন বাবু—বাবাজী বড্ড লাজুক। তা' আমি বলি, ফাজিল ফক্কড়ের যুগে বিনয়া, নম্র, মুখচোরা ছেলেই ভালো! কি বলেন মশাই?

প্রাণধন ॥ (স্বগত) ব্যাটাচ্ছেলে তবে বোবা কি! তবেই সেরেছে! (প্রকাশ্যে) তা' তো বটেই! তা' তো বটেই! তবে কি না চাঁদমুখে দু-চারটি কথা না শুন্‌লে প্রাণ তো জুড়োবে না ভায়া। (চন্দ্রবদনকে) বাবা চন্দ্রবদন! শরীর গতিক ভালো তো বাবা?

চন্দ্রবদন বিনীতভাবে ঘাড় নাড়িয়া ভালো আছে জানাইল

প্রাণধন ॥ (স্বগত) ব্যাটাচ্ছেলে নির্ঘাত বোবা। (প্রকাশ্যে) এ্যা, শরীর ভালো নেই?

পদ্মলোচন ॥ (স্বগত) মতলব ভালো নয় দেখচি! (প্রাণধনকে) দেখুন—জীবনধনবাবু—

প্রাণধন ॥ (স্বগত) ভুল নামে আমাকে ডেকে, আমাকে ডিরেল করতে চাইছে, তা' ভবী ভুলবে না। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, বলুন—

পদ্মলোচন ॥ (স্বগত) ওরে বাবা! এ-শালা দেখ্‌ছি আমাদের চেয়েও সেয়ানা। (প্রকাশ্যে) আপনি জীবনধন, না প্রাণধন?

প্রাণধন ॥ (স্বগত) পুচকে ছোঁড়া, আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এসেছো। (প্রকাশ্যে) ও বাবা, যে প্রাণধন সে-ই জীবনধন। (চন্দ্রবদনকে) আচ্ছা বাবা বংশীবদন, এমন সুন্দর নামটি তোমার কে রেখেছে বাবা? না, না, লজ্জা কি? বলো না বাবা।

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগত্) এ-শালা শ্বশুর হ'লে বিপদ দেখছি। (প্রকাশ্যে) আ···প···নি মশা···ই জী···বনধন হ'লে আ···মিও মশাই বং···বদন।

প্রাণধন ॥ (স্বগত) এই রে। ব্যাটাচ্ছেলে তোত্‌লা। যাক, তবু মন্দের ভালো—বোবা তো নয়। (প্রকাশ্যে) তা' খুব জ্ঞানের কথা বলেছো বাবাজী—বেশ বলেছো—বেশ বলেছো। এসো—এসো বাবা কৃষ্ণধন, নিয়ে এসো—বিদুরের খুঁদ কুঁড়ো নিয়ে এসো।

রাখোহরি এবং পদ্মলোচন পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া খুশির ভাবই দেখাইল। কৃষ্ণধন ও পরিচারিকা জলখাবার ও চা লইয়া প্রবেশ করিল

রাখোহরি ॥ (স্বগত) ওরে শালা, চার পয়সার তেলেভাজা ফুলুরি হ'লো গিয়ে তোমার বিদুরের খুঁদ কুঁড়ো। (প্রকাশ্যে) ওরে বাবা। এ যে একেবারে নারায়ণ সেবার আয়োজন করেছেন। কিন্তু জানেন না তো—আমার আবার কলিক্—মা নাম রেখেছিলেন রাখোহরি—সেই হরি-ই কোনোমতে ধ'রে রেখেছেন—তাই এখনো আছি। আমি ঐ একটু চা-ই খাবো—আর কিছু আমার চলবে না।

পদ্মলোচন ॥ (স্বগত) শালা দেখছি একেবারে হাড় কেপ্পণ। যা দিয়েছে—তা'ও যদি না খাই—দোকানে ফেরত দেবে। (খেতে খেতে প্রকাশ্যে) চমৎকার। চমৎকার। এমন ফুলুরি জীবনে খাই নি—রসগোল্লা লাগে কোথায়।

প্রাণধন ॥ (স্বগত) ওরে বাবা। গো-গ্রাসে গিল্‌ছে যে। আবার চেয়ে না বসে। (প্রকাশ্যে) কৃষ্ণধন হাঁ করে দেখ্‌ছিস কি ? শীগ্‌গির খুকীকে নিয়ে আয়—অমৃত যোগটা চ'লে যাচ্ছে যে।

কৃষ্ণধনের অন্দরে প্রস্থান

ফুলুরির সব ভালো—খারাপটা শুধু এই—সব পেটে সয় না।

পদ্মলোচন ॥ (স্বগত) ওরে শালা, বাগ্‌ড়া দিচ্ছ ! (প্রকাশ্যে) আমার খুব সয়। বরং আর কিছু তেমন সয় না। আমার ভাইটিরও অনেকটা তা-ই। হ্যাঁ, প্লেট্‌ও তো খালি হ'য়ে এলো। তা' মামা, আজকালকার দিনে এমন ক'রে তুমি একপ্লেট খাবার নষ্ট ক'রছো—খাদ্যমন্ত্রী এমন অপ্রফুল্ল হবেন, চাই কি চাকরি নিয়ে টানাটানি হ'তে পারে—দরকার নেই বাবা—(মামার প্লেট্‌ টানিয়া লইয়া) নে ভাই, দুজনে সাবাড় ক'রে দিই। স্বাধীনতার পর খাদ্য অপচয় করা আর চলে না।

প্রাণধন ॥ (স্বগত) বেটারা রাক্ষস দেখছি ! এ ঘরে মেয়ে দেবো ! (প্রকাশ্যে) তোমারা বাবা সাক্ষাৎ নারায়ণ—তাই বাবা এই গরীব বিদুরের খুঁদ কুঁড়ো চেটেপুটে খেলে !

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগত) শালা এ-দিকে হাড় কেপ্পণ, কিন্তু কথায় দাতাকর্ণ ! (প্রকাশ্যে) মামা এতো খেয়ে পেট গরম হ'য়ে, আমার মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে—আ···র কতক্ষণ ব'···সুবে···ব···লো ?

রাখোহরি ॥ (স্বগত) এই সেরেছে—রেগে গেছে। তোৎলামি বাড়লে বরপণটা কমে যাবে এ কথাটা বাবাজীকে আমি কেমন ক'রে

বোঝাই! (প্রকাশ্যে) বুঝলে বাবাজী, সবুরে মেওয়া ফলে—জানো তো?…ঐ তো এসে গেছে।

কৃষ্ণধন সুনয়নীকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিল

প্রাণধন ॥ (স্বগত) রাতকাণা মেয়ে, শালারা এলো রাতে—এখন শেষ রক্ষা হ'লে হয়—(প্রকাশ্যে) নমস্কার কর খুকী—বোস!

সুনয়নী তাহা করিল

রাখোহরি ॥ (স্বগত) বিশ বছরের ধাড়ি হ'লো কিনা খুকী! (প্রকাশ্যে) খুকীমা, এদিকে তাকাও। তোমার নাম?

সুনয়নী ॥ (স্বগত) বেটারা টের পেল নাকি? (প্রকাশ্যে) আমার নাম শ্রীমতী সুনয়নী দেবী।

পদ্মলোচন ॥ (স্বগত) আমি একটু টেরা ব'লে বাপ-মা নাম রেখেছিলেন পদ্মলোচন! বেড়াল চোখা মেয়ে—ইনি হ'লেন গিয়ে সুনয়নী! (প্রকাশ্যে) নাম সার্থক হ'য়েছে। কি সুন্দর চোখ দুটি!

রাখোহরি ॥ (স্বগত) কেমন ড্যাব্ ড্যাব্ ক'রে তাকাচ্ছে—রাতকাণা নয় তো! মরুক গে। আসল কথা হ'লো গিয়ে বরপণের অঙ্কটা—সে-টা মোটা হ'লে এক্সট্রা লাইট ফিট ক'রে ভোঁতা চোখও চোখা ক'রে দেওয়া যাবে। (প্রকাশ্যে) না, না—বেশ মেয়ে! কেমন দুগ্গো পতিমা—দুগ্গো পতিমা ভাব। তা' প্রাণধনবাবু, এবার ও-ঘরটায় চলুন—আমাদের সকলেরই প্রাণের কথাবার্তাটা একটু হ'ক।

প্রাণধন ॥ (স্বগত) এইরে! শালারা এবার আমাকে টাইট্ দিতে নিয়ে চ'ললো! সুবিধে হবে না। মেয়ে যে রাতকাণা তা' এখনো ধরা পড়েনি—ছেলে যে তোতলা আমি ধ'রে ফেলেছি। (প্রকাশ্যে) বটেই তো—বটেই তো। চলো বাবা কৃষ্ণধন—এঁদের নিয়ে ও-ঘরে চলো।

পাত্র ও পাত্রীকে এই ঘরে রাখিয়া অন্য সকলের পার্শ্ববর্তী ঘরে প্রস্থান।

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগত) ও বাবা ! আমার দিকে না তাকিয়ে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে যে। (প্রকাশ্যে) ও-দিকে কী দেখছো সুনয়নী ?

সুনয়নী ॥ (স্বগত) এই রে। ধ'রে ফেল্‌লে বুঝি। (প্রকাশ্যে) কি আবার দেখছি ! কিছুই দেখছি না।

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগত) তবে কি চোখের মাথাটি খেয়েছো ! (প্রকাশ্যে) আ-হা—তুমি তো রাতকাণা নও।

সুনয়নী ॥ (স্বগত) জানি ধ'রে ফেলবে ! বাবাকে এতো ক'রে বলি, আমার বিয়ের চেষ্টা ক'রো না—তা' শুনবে না। কিন্তু এ অপমান আর আমি সইতে পারবো না। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ মশাই, আমি একটু রাতকাণা।

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগত) এই রাতকাণা মেয়ে নিয়ে আমাকে ঘর ক'রতে হবে সারা জীবন ! (প্রকাশ্যে) তুমি রাত···কাণ তো···তো···মার বা···বা আ·· গ ব···লেননি কেন ?

সুনয়নী ॥ (স্বগত) নাম তো শুনেছিলাম চন্দ্রবদন—সে বদনের বুলি তো দেখছি, তোতো—তোতো, (প্রকাশ্যে) আপনি তোতলা এ-কথা আপনার মামা আগে বলেননি কেন ?

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগত) এই সেরেছে ! ধ'রে ফেলেছে,। (প্রকাশ্যে) যাক, যাক। ত'াতে ক্ষতি কি হ'য়েছে ? তুমিও ধ'রোনা—আমিও ধ'রবো না। শুধু একটি কথা। বিয়ের আসরে আমার গলায় মালা দিতে গিয়ে, দেখো যেন আর কারুর গলায় মালা দিও না। কি বলো সুনয়নী ?

সুনয়নী ॥ (স্বগত) পথে এসো। (প্রকাশ্যে) নিশ্চয়ই। তবে আপনি একটু ম্যানেজ ক'রে নেবেন।

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগত) পথে এসো। (প্রকাশ্যে) তা' ম্যানেজ একটু ক'রে নিতে হবে বৈকি। নইলে, সারাজীবন কি আমরা আইবুড়ো আইবুড়ী থাকবো ? পরীক্ষা তুমিও কম দাওনি—আমিও কম দিইনি। আর কেন। এই যে আমি এখানে—একটু কাছে এসো।

জান্‌লে, রেগে গেলেই আমি তোতো করি! দোহাই লক্ষ্মীটি, আমার মাথাটা ঠাণ্ডা রেখো। রাতের ভাবনা?—ও আমি ম্যানেজ ক'রে নেবো।

যবনিকা

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মন্মথ রায়ের আধুনিকতম নাট্যার্ঘ

ধর্মঘট—পথে বিপথে—চাষীর প্রেম—আজব দেশ

চারিটি পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংকলন গ্রন্থ—মূল্য চার টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৬

অভিমত

স্বাধীনতা

২৪শে মার্চ, ১৯৫৭

অবশেষে এমন একটি নাট্যগ্রন্থ হাতে এসে পড়লো যা শুধু নামকরণের দিক থেকেই প্রচলিত দেশীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করেনি, ভাবৈশ্বর্যেও যা একালের বাংলার "বুনিয়াদী" নাট্যধারায় একটি অঘটন সৃষ্টি করেছে।

এই অঘটন সৃষ্টি যদি কোন তরুণের দ্বারা সংঘটিত হতো তাহলে তারিফ করেও শুধুমাত্র যুগোপযোগী চেতনার বিকাশ বলা যেত। কিন্তু উত্তাল জনসমুদ্র থেকে বিক্ষিপ্ত, জীবন ও জীবিকার তাগিদে দীর্ঘকাল শৃঙ্খলিত, একদা বহুসম্ভাবনার স্বাক্ষরবহনকারী কোন এক প্রবীণের দ্বারা নিজেদের রচিত স্থাণু ও অনড় পথ যখন ছিন্ন হলো, পরিত্যক্ত হলো সমগ্র জীবনের পুষ্ট এক বিশেষ সত্বা, তখন কেবল "যুগোপযোগী চেতনার বিকাশ" বললেই সব বলা হয় না, বলতে হয় "মহীয়ান এক শিল্পীর নবজন্ম"। আলোচ্য গ্রন্থে বাংলার অগ্রজ নাট্যকার মন্মথ রায়ের সেই 'নবজন্ম' হয়েছে।

"ধর্মঘট, পথে বিপথে, চাষীর প্রেম এবং পরিবর্দ্ধিত আজবদেশ"—আমার এই চারিখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক ১৯৫২-৫৩ সনে রচিত হইয়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রমিক জীবনের পটভূমিতে 'ধর্মঘট', মধ্যবিত্ত জীবনের পটভূমিতে 'চাষীর প্রেম' এবং গণজীবনের পটভূমিতে ব্যঙ্গাত্মক 'আজবদেশ' পরিকল্পিত হইয়াছে—" নাট্যকার ঘোষিত এই বিজ্ঞপ্তিতেই নাটক চারটির

বিষয়বস্তু নির্বাচন পরিস্ফুট। নাটকগুলির রচনা-কালের যে সময় উল্লেখ করা হয়েছে তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পাঁচ বছর কেটে যাবার পরই এই নাটকগুলি লেখা। দীর্ঘ আকাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ হলো, দেশ শাসনের ভার স্বহস্তে পেলাম, নিজেদের রাষ্ট্র পতাকা উড্ডীন হলো আকাশে—তারপর এমন কি অঘটন ঘটলো যে 'কারাগার', 'মীরকাশিম', 'মহুয়া', 'রাজনর্তকী'র নাট্যকারকে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে হবে? গণজীবনে এমন কি সংঘাতের পরিচয় তিনি পেলেন যে পরিহাসে ও ব্যঙ্গে শাণিত হয়ে উঠলো তাঁর লেখনী? দীর্ঘকাল তো সে লেখনী স্তব্ধ ছিল। বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে নাটকের মাধ্যমে সংগ্রামে তিনি যে যশোলাভ করেছিলেন তা তো তাঁকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানজনক স্থানই দিয়েছে! এর পরেও কেন? এই 'কেন'র জবাব পাওয়া যাবে আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গিরিশচন্দ্রকে কবি নবীনচন্দ্র সেনের রেঙ্গুন থেকে লেখা একটি চিঠিতে। তখন গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' প্রকাশিত হয়েছে। দেশে তাই নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন—বৃটিশরাজ সন্ত্রস্ত। নবীনচন্দ্র গিরিশকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে চিঠির সমাপ্তিতে লিখলেন "কিছু বেশী দিন সময় লইয়া আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা, জলহীনতা শিক্ষাবিভ্রাট, চাকরী-বিভ্রাট, উকিল-ডাক্তারী বিভ্রাট, বিচার-বিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি—সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া এক-খানি Comic Tragic নাটক লিখিয়া দেশ রক্ষা কর।" ২৭।৮।১৯০৬—অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেই বাংলার নাট্যকারের কাছে বাঙালী হৃদয়ের দাবী এসেছিল যে বাস্তব জীবনকে স্বীকার করে নাটক লেখ, গণজীবনের হাসি অশ্রু তোমাদের লেখায় ভাষা পাক্। সেদিনের দাবী গিরিশচন্দ্র স্বীকার করলেও বাংলার নাট্য-সাহিত্য সেই খাতে প্রবাহিত হয় নি। প্রবাহিত হয়েছে মূলতঃ গিরিশ পরিকল্পিত রোমান্টিক দেশাত্মবোধের ধারায়। বিংশ শতকের জীবিত ও মৃত অধিকাংশ প্রবীণ নাট্যকারই তাই গিরিশচন্দ্রের মানসসন্তান। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ধারাই বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি বড় স্থান

জুড়ে রয়েছে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের দাবী সমগ্র বাঙালীর দাবী হয়ে তখনও বিরাজমান। এরই মাঝে ১৯৪৩ সালে জন্ম হয় মন্বন্তরের বিপ্লবী নাট্যকারদের। মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই এঁরা বাঙালী চিত্ত জয় করে নিতে সক্ষম হন। রচনা-শৈলীতে এঁদের নিপুণতার অভাব থাকলেও বাঙালী দর্শক ও পাঠক পেলো তাদের দাবীর স্বীকৃতি। মজুর, চাষী, মধ্যবিত্ত এঁদের নায়ক-নায়িকা হলেন। তাদেরই জয়গান ধ্বনিত হয়ে উঠলো এঁদের নাটকে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন শক্তি দেখা দিল। অগ্রজ প্রবীণ নাট্যকাররা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অনেকেই এঁদের অভিনন্দন জানালেন সত্য, কিন্তু নিজেদের লেখনী এই পথে চালিত করতে পারলেন না। বিহ্বলতার পরে দেখা দিল লেখনীর স্তব্ধতা। তাই ক্রমেই বাংলার স্থায়ী মঞ্চে সংকট দেখা দিল। আর্তনাদ উঠলো —নাটক নেই, নাটক নেই। অথচ বিস্ময়ের কথা যে, এ যুগে বাংলার নগরে প্রান্তরে দিবা নিশি শত শত নাটকের জন্ম হচ্ছিল। প্রবীণ নাট্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ এ যুগে দু-একখানা যুগোপযোগী নাটক সৃষ্টি করেননি তা নয়, কিন্তু অগ্রজপ্রধানদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না থাকায় তা সমগ্র ধারার মোড় ফেরাতে পারেনি। অবশেষে আজ দেখতে পাচ্ছি সেই অগ্রজদের মধ্যমণি, স্থায়ী সম্মানের অধিকারী একজন,—নাট্যকার মন্মথ রায় বাংলা নাটকের সেই অচ্ছুৎ অথচ প্রবল শক্তির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেনই না, অমিত তেজ নিয়ে দাঁড়ালেন। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ এসব নাটকে কোথাও নেই, আছে চেতনার স্বতস্ফূর্ত জাগরণ। তাই অশ্রু এখানে গ্লিসারিন দেওয়া নয়, বুক ফাটা কান্নারই প্রকাশ; ধিক্কার এখানে চীৎকারে পর্যবসিত না হয়ে পেয়েছে শাণিত ব্যঙ্গের রূপ; হাসি সুড়সুড়ি দিয়ে নয়, আনন্দের প্রাণখোলা অভিব্যক্তি।

শুধু 'মেঠো লোকেরাই' এ নাটক চারিটির রসাস্বাদনে তৃপ্ত হবেন না, ইংরেজী নাটক পড়ুয়ারাও পড়ে বিস্মিত হবেন।

রচনাশৈলী সম্পর্কে মুন্সীয়ানা আনতে হলে প্রত্যেকটি তরুণ নাট্যকারের এ নাটক চারটি পড়া দরকার; আর অভিনয়—একসঙ্গে এমন চারিটি নাটক অভিনয় করা যে কোন নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে গৌরবের।